মহুয়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৩৬

সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৪১

পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৩৪৫, অগ্রহায়ণ ১৩৪৯, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩

আশ্বিন ১৩৫৫, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭, শ্রাবণ ১৩৬০

বৈশাখ ১৩৬৩

মহুয়ার অধিকাংশ কবিতা ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ হইতে পৌষ মাসের মধ্যে রচিত।

শেষের কবিতা উপন্যাসের জন্য ইহার পূর্বেই কয়েকটি কবিতা লিখিত হইয়াছিল। ভাবানুষঙ্গবশতঃ সেই কবিতাগুলি মহুয়াতেও মুদ্রিত হইয়াছে। সূচীতে তারকাচিহ্নের দ্বারা সেগুলি নির্দেশ করা হইয়াছে।

পূরবী প্রকাশিত হইবার পর ও মহুয়া প্রকাশিত হইবার পূর্বে রচিত হইয়াছে এমন অনেক কবিতা মহুয়াতে প্রকাশিত হয় নাই। মহুয়ার সূচনা-রূপে রবীন্দ্রনাথের যে চিঠিটি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে তাহার কারণ আলোচিত হইয়াছে।

মহুয়া সম্পর্কে অন্য বহু তথ্য পঞ্চদশখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হইয়াছে।
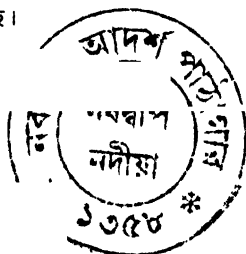
সূচীপত্র

শুধায়ো না, কবে কোন্ গান	...	উৎসর্গ
উজ্জীবন	...	১১
বোধন	...	১৩
বসন্ত	...	১৭
বরযাত্রা	...	১৯
মাধবী	...	২১
বিজয়ী	...	২২
প্রত্যাশা	...	২৩
অর্ঘ্য	...	২৫
দ্বৈত	...	২৭
সন্ধান	...	২৯
উপহার	...	৩০
শুভযোগ	...	৩১
মায়া	...	৩২
*নির্ঝরিণী	...	৩৪
*শুকতারা	...	৩৫
প্রকাশ	...	৩৭
বরণডালা	...	৩৯
মুক্তি	...	৪১
উদ্ঘাত	...	৪৩
অসমাপ্ত	...	৪৫
নিবেদন	...	৪৭
*অচেনা	...	৪৯
অপরাজিত	...	৫১
নির্ভয়	...	৫৩
*পথের বাঁধন	...	৫৫
দূত	...	৫৭

পরিচয়	...	৫৯
দায়মোচন	...	৬১
সবলা	...	৬৩
প্রতীক্ষা	...	৬৫
লগ্ন	...	৬৭
সাগরিকা	...	৭০
বরণ	...	৭৪
পথবর্তী	...	৭৭
মুক্তরূপ	...	৭৯
স্পর্ধা	...	৮১
রাখীপূর্ণিমা	...	৮২
আহ্বান	...	৮৩
বাপী	...	৮৪
মহুয়া	...	৮৭
দীনা	...	৮৯
সৃষ্টিরহস্য	...	৯১
নাম্নী : শামলী	...	৯২
কাজলী	...	৯৪
হেঁয়ালি	...	৯৫
খেয়ালী	...	৯৭
কাকলী	...	৯৯
পিয়ালী	...	১০০
দিয়ালী	...	১০১
নাগরী	...	১০২
সাগরী	...	১০৪
জয়তী	...	১০৫
ঝামরী	...	১০৬
মুরতি	...	১০৮
মালিনী	...	১১০
করুণী	...	১১১

প্রতিমা ... ১১৩
নন্দিনী ... ১১৫
উষসী ... ১১৬
ছায়ালোক ... ১১৮
প্রচ্ছন্না ... ১২১
দর্পণ ... ১২৪
ভাবিনী ... ১২৫
একাকী ... ১২৭
আশীর্বাদ ... ১২৮
নববধূ ... ১৩০
পরিণয় ... ১৩২
মিলন ... ১৩৩
বন্দিনী ... ১৩৫
গুপ্তধন ... ১৩৭
প্রত্যাগত ... ১৩৮
পুরাতন ... ১৪০
ছায়া ... ১৪১
*বাসরঘর ... ১৪৩
বিচ্ছেদ ... ১৪৪
*বিদায় ... ১৪৫
*প্রণতি ... ১৪৯
*নৈবেদ্য ... ১৫১
*অশ্রু ... ১৫২
*অন্তর্ধান ... ১৫৩
বিরহ ... ১৫৪
বিদায়সম্বল ... ১৫৬
দিনান্তে ... ১৫৮
অবশেষ ... ১৫৯
শেষ মধু ... ১৬১

সূচনা

লেখার বিষয়টা ছিল সংকল্প-করা— প্রধানত প্রজাপতির উদ্দেশে, আর তাঁরই দালালি করেন যে দেবতা তাঁকেও মনে রাখতে হয়েছিল। অতএব, 'মহুয়া'র কবিতাকে ঠিক আমার হালের কবিতা ব'লে শ্রেণীবদ্ধ করা চলে না। ভেবে দেখতে গেলে, এটা কোনো কালবিশেষের নয়, এটা আকস্মিক। আমার সত্যিকার আধুনিক কবিতার সঙ্গে যদি এদের এক পঙ্‌ক্তিতে বসাও তা হলে তাদের বর্ণভেদ অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে, কিছু যেন অত্যুক্তি করা হল। ফরমাশ ব্যাপারটা মোটরগাড়ির স্টার্টারের মতো। চালনাটা শুরু করে দেয়, কিন্তু তার পরে মোটরটা চলে আপন মোটরিক প্রকৃতির তাপে। প্রথম ধাক্কাটা একেবারেই ভুলে যায়। মহুয়ার কবিতাগুলিও লেখবার বেগে ফরমাশের ধাক্কা নিঃসন্দেহই সম্পূর্ণ ভুলেছে— কল্পনার আন্তরিক তড়িৎ-শক্তি আপন চিরন্তনী প্রেরণায় তাদের চালিয়ে নিয়ে গেছে। প্রথম হাতল-ঘোরানো হতেও পারে বাইরের থেকে, কিন্তু সচলতা শুরু হবা-মাত্রই লেখবার আনন্দই সারথি হয়ে বসে। এইজন্য আমার বিশ্বাস, তোমরা এই লেখার মধ্যে নতুন কিছু পাবে, আকারে এবং প্রকারে। নতুন লেখার ঝোঁক যখন চিত্তের মধ্যে এসে পড়ে তখন তারা পূর্বদলের পুরানো পরিত্যক্ত বাসায় আশ্রয় নিতে চায় না; নতুন বাসা না বাঁধতে পারলে তাদের মানায় না, কুলোয় না। 'ক্ষণিকা'র বাসা আর 'বলাকা'র বাসা এক নয়।

আমি নিজে মহুয়ার কবিতার মধ্যে দুটো দল দেখতে পাই। একটি হচ্ছে নিছক গীতিকাব্য, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গীতেই

তার লীলা ; তাতে প্রণয়ের প্রসাধনকলা মুখ্য। আর-একটিতে ভাবের আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধনবেগই প্রবল।

মহুয়ার 'মায়া' নামক কবিতায় প্রণয়ের এই দুই ধারার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রেমের মধ্যে সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া প্রবল। প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ ক'রে রচনা করে নিজের ভিতরকার বর্ণে, রসে, রূপে। তার সঙ্গে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি থেকে নানা গান গন্ধ, নানা আভাস। এমনি ক'রে অন্তরে-বাহিরের মিলনে চিত্তের নিভৃত লোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নির্মিত হতে থাকে ; সেখানে ভাবে-ভঙ্গীতে সাজে-সজ্জায় নূতন নূতন প্রকাশের জন্য ব্যাকুলতা ; সেখানে অনির্বচনীয়ের নানা ছন্দ, নানা ব্যঞ্জনা। এক দিকে এই প্রসাধনের বৈচিত্র্য, আর-এক দিকে এই উপলব্ধির নিবিড়তা ও বিশেষত্ব। মহুয়ার কবিতা চিত্তের সেই মায়ালোকের কাব্য ; তার কোনো অংশে ছন্দে ভাষায় ভঙ্গীতে এই প্রসাধনের আয়োজন, কোনো অংশে উপলব্ধির প্রকাশ।

এই দুয়ের মধ্যে নূতনের বাসন্তিক স্পর্শ নিশ্চয় আছে, নইলে লিখতে আমার উৎসাহ থাকত না। তুমি তো জানই কত অল্প সময়ের মধ্যে এগুলি সমাধা করেছি। তার কারণ, প্রবর্তনার বেগ মনে সতেজ ছিল। তাই অন্যমনস্কভাবে এই পত্রের পূর্বাংশে তোমাকে যা লিখেছি অপরাংশে তার প্রতিবাদ করতে হল। বলেছিলুম, এ লেখাগুলি আকস্মিক। ভুলেছিলুম, সব কবিতাই যখনি লেখা যায় তখনি আকস্মিক। সব কবিতা বললে হয়তো বেশি বলা হয়। এক-একটা সময়ের এক-একটা নতুন ঝোঁকের কবিতা। বারো মাসে পৃথিবীর ছয় ঋতু বাঁধা, তাদের পুনরাবর্তন ঘটে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, একবার আমার মন থেকে যে ঋতু যায় সে আর-এক অপরিচিত ঋতুর

জন্যে জায়গা ক'রে বিদায় গ্রহণ করে। পূর্বকালের সঙ্গে কিছু মেলে না এ হতেই পারে না, কিন্তু সে যেন শরতের সঙ্গে শীতের মিলের মতো। মনের যে ঋতুতে মহুয়া লেখা সে আকস্মিক ঋতুই, ফরমাশের ধাক্কায় আকস্মিক নয়, স্বভাবতই আকস্মিক। এগুলি যখন লিখছিলুম অপূর্বকুমার প্রায় রোজ এসে শুনে যেত, সে যে উত্তেজনা প্রকাশ করত সেটা অপূর্বতারই উত্তেজনা। রূপের দিকে বা ভাবের দিকে একটা-কিছু নতুন পাচ্ছে বলেই তার আগ্রহ— তখন সুধীন্দ্র দত্তও ছিল তার সঙ্গী। তার থেকে আমার বিশ্বাস আপনার এই সমর্থন পেত যে, মনের মধ্যে রচনার একটি বিশেষ ঋতুর সমাগম হয়েছে— তাকে 'পূরবী'র ঋতু বা 'বলাকা'র ঋতু বললে চলবে না।

পূরবী ও মহুয়ার মাঝখানে আর-এক দল কবিতা আছে, সেগুলি অন্য জাতের। তাদের মধ্যে নটরাজ ও ঋতুরঙ্গই প্রধান। নৃত্যাভিনয়ের উপলক্ষ্য নিয়ে এগুলি রচিত হয়েছিল, কিন্তু এরাও স্বভাবতই উপলক্ষ্যকে অতিক্রম করেছে। আর কোনোখানেই শান্তিনিকেতনের মতো ঋতুর লীলারঙ্গ দেখি নি; তারই সঙ্গে মানবভাষায় উত্তর-প্রত্যুত্তর কিছুকাল থেকে আমার চলছে। তার রীতিমত শুরু হয়েছে শারদোৎসবে; তার পরে ঋতুগীতির প্রবাহ বেয়ে এসে পড়েছিল ঋতুরঙ্গে। বিষয় এক, তবু প্রভেদ যথেষ্ট। সেই প্রভেদ যদি না থাকত তা হলে লেখবার উৎসাহই থাকত না। মহুয়ার কবিতা যখন পড়বে তখন আমার স্বভাবের এই কথাটা মনে রেখো। এই বইয়ের প্রথমে ও সব-শেষে যে গুটিকয়েক কবিতা আছে সেগুলি মহুয়া-পর্যায়ের নয়। সেগুলি ঋতু-উৎসব-পর্যায়ের। দোলপূর্ণিমায় আবৃত্তির জন্যেই এদের রচনা করা হয়েছিল। কিন্তু নববসন্তের আবির্ভাবই মহুয়া কবিতার উপযুক্ত ভূমিকা ব'লে নকিবের কাজে ওদের এই গ্রন্থে আহ্বান করা হয়েছে।

মহুয়া নামটা নিয়ে তোমার মনে একটা দ্বিধা হয়েছিল জানি। কাব্যের বা কাব্যসংকলন-গ্রন্থের নামটাকে ব্যাখ্যা-মূলক করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। নামের দ্বারা আগে-ভাগে কবিতার পরিচয়কে সম্পূর্ণ বেঁধে দেওয়াকে আমি অত্যাচার মনে করি। কবিতার অতিনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রায়ই দেওয়া চলে না। আমি ইচ্ছা করেই মহুয়া নামটি দিয়েছি, নাম পাছে ভাষ্যরূপে কর্তৃত্ব করে এই ভয়ে। অথচ কবিতা-গুলির সঙ্গে মহুয়া নামের একটুখানি সংগতি আছে— মহুয়া বসন্তেরই অনুচর, আর ওর রসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে উন্মাদনা। যাই হোক, অর্থের অত্যন্ত বেশি সুসংগতি নেই ব'লেই কাব্য-গ্রন্থের পক্ষে এ নামটি উপযুক্ত ব'লে আমি বিশ্বাস করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
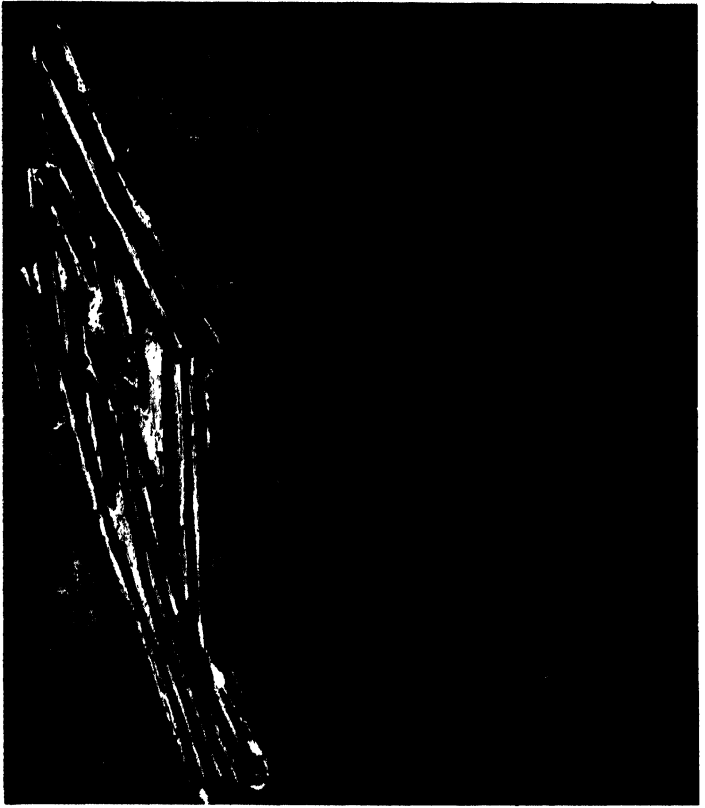
শুধায়ো না, কবে কোন্ গান
কাহারে করিয়াছিনু দান।
পথের ধূলার 'পরে
পড়ে আছে তারি তরে
যে তাহারে দিতে পারে মান।

তুমি কি শুনেছ মোর বাণী,
হৃদয়ে নিয়েছ তারে টানি'?
জানি না তোমার নাম,
তোমারেই সঁপিলাম
আমার ধ্যানের ধনখানি॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উজ্জীবন

ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু,
রুদ্রবহ্নি হতে লহো জ্বলদর্চি তনু।
যাহা মরণীয় যাক মরে,
জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধরে।
যাহা রূঢ়, যাহা মূঢ় তব,
যাহা স্থূল, দগ্ধ হোক ; হও নিত্য নব।
মৃত্যু হতে জাগো পুষ্পধনু—
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু॥

মৃত্যুঞ্জয় তব শিরে মৃত্যু দিলা হানি,
অমৃত সে মৃত্যু হতে দাও তুমি আনি।
সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ
উন্মুক্ত করুক অগ্নি-উৎসের প্রবাহ।
মিলনেরে করুক প্রখর,
বিচ্ছেদেরে ক'রে দিক্ দুঃসহ সুন্দর।
মৃত্যু হতে জাগো পুষ্পধনু—
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু॥

দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর যে পথ
সে দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ।
তিমিরতোরণে রজনীর
মন্দ্রিবে সে রথচক্র-নির্ঘোষ গম্ভীর।
উল্লঙ্ঘিয়া তুচ্ছ লজ্জা ত্রাস
উচ্ছলিবে আত্মহারা উদ্‌বেল উল্লাস।
মৃত্যু হতে ওঠো পুষ্পধনু—
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু॥

? ভাদ্র, ১৩৩৬
[শান্তিনিকেতন]

বোধন

মাঘের সূর্য উত্তরায়ণে
পার হয়ে এল চলি,
তার পানে হায় শেষ চাওয়া চায়
করুণ কুন্দকলি।
উত্তরবায় একতারা তার
তীব্র নিখাদে দিল ঝংকার,
শিথিল যা ছিল তারে ঝরাইল—
গেল তারে দলি দলি॥

শীতের রথের ঘূর্ণিধূলিতে
গোধূলিরে করে ম্লান'।
তাহারি আড়ালে নবীন কালের
কে আসিছে সে কি জান।
বনে বনে তাই আশ্বাসবাণী
করে কানাকানি 'কে আসে কী জানি',
বলে মর্মরে 'অতিথির তরে
অর্ঘ্য সাজায়ে আনো'। .

নির্মম শীত তারি আয়োজনে
এসেছিল বনপারে।
মার্জিয়া দিল শ্রান্তি ক্লান্তি,
মার্জনা নাহি কারে।

ম্লান চেতনার আবর্জনায়
পান্থের পথে বিঘ্ন ঘনায়,
নবযৌবনদূতরূপী শীত
দূর করি দিল তারে ॥

ভরা পাত্রটি শূন্য করে সে
ভরিতে নূতন করি।
অপব্যয়ের ভয় নাহি তার
পূর্ণের দান স্মরি।
অলস ভোগের গ্লানি সে ঘুচায়,
মৃত্যুর স্নানে কালিমা মুছায়,
চিরপুরাতনে করে উজ্জ্বল
নূতন চেতনা ভরি ॥

নিত্যকালের মায়াবী আসিছে
নব পরিচয় দিতে।
নবীন রূপের অপরূপ জাদু
আনিবে সে ধরণীতে।
লক্ষ্মীর দান নিমেষে উজাড়ি
নির্ভয়মনে দূরে দেয় পাড়ি,
নববর সেজে চাহে লক্ষ্মীরে
ফিরে জয় করে নিতে।

বাঁধন ছেঁড়ার সাধন তাহার,
সৃষ্টি তাহার খেলা

দস্যুর মতো ভেঙেচুরে দেয়
চিরাভ্যাসের মেলা।
মূল্যহীনেরে সোনা করিবার
পরশপাথর হাতে আছে তার,
তাই তো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে
উদ্ধত অবহেলা॥

বলো 'জয় জয়', বলো 'নাহি ভয়'—
কালের প্রয়াণপথে
আসে নির্দয় নবযৌবন
ভাঙনের মহারথে।
চিরন্তনের চঞ্চলতায়
কাঁপন লাগুক লতায় লতায়,
থরথর করি উঠুক পরান
প্রান্তরে পর্বতে॥

বার্তা ব্যাপিল পাতায় পাতায়—
'করো ত্বরা, করো ত্বরা
সাজাক পলাশ আরতিপাত্র
রক্তপ্রদীপে ভরা।
দাড়িম্ববন প্রচুর পরাগে
হোক প্রগল্‌ভ রক্তিম রাগে,
মাধবিকা হোক সুরভিসোহাগে
মধুপের মনোহরা।'

কে বাঁধে শিথিল বীণার তন্ত্র
কঠোর যতন-ভরে—
ঝংকারি উঠে অপরিচিতার
জয়সংগীতস্বরে।
নগ্ন শিমুলে কার ভাণ্ডার
রক্ত দুকূল দিল উপহার,
দ্বিধা না রহিল বকুলের আর
রিক্ত হবার তরে॥

দেখিতে দেখিতে কী হতে কী হল—
শূন্য কে দিল ভরি।
প্রাণবন্যায় উঠিল ফেনায়ে
মাধুরীর মঞ্জরী।
ফাগুনের আলো সোনার কাঠিতে
কী মায়া লাগালো, তাই তো মাটিতে
নবজীবনের বিপুল ব্যথায়
জাগে শ্যামাসুন্দরী॥

দোলপূর্ণিমা, ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

বসন্ত

ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী,
বাজে বাণী তব মাভৈঃ মাভৈঃ,
বন্দীরা পেল ছাড়া।
দিগন্ত হতে শুনি তব স্বর
মাটি ভেদ করি উঠে অঙ্কুর,
কারাগারে দিল নাড়া।
জীবনের রণে নব অভিযানে
ছুটিতে হবে-যে নবীনেরা জানে—
দলে দলে আসে আমের মুকুল,
বনে বনে দেয় সাড়া॥

কিশলয়দল হল চঞ্চল,
উতল প্রাণের কলকোলাহল
শাখায় শাখায় উঠে।
মুক্তির গানে কাঁপে চারি ধার,
কানা দানবের মানা-দেওয়া দ্বার
আজ গেল সব টুটে।
মরুযাত্রার পাথেয়-অমৃতে
পাত্র ভরিয়া আসে চারি ভিতে
অগণিত ফুল, গুঞ্জনগীতে
জাগে মৌমাছিপাড়া॥

ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী,
দুর্গ কোথায়, অস্ত্র বা কই,
কেন সুকুমার বেশ।
মৃত্যুদমন শৌর্য আপন
কী মায়ামন্ত্রে করিলে গোপন—
তূণ তব নিঃশেষ।
বর্ম তোমার পল্লবদলে,
আগ্নেয় বাণ বনশাখাতলে
জ্বলিছে শ্যামল শীতল অনলে
সকল তেজের বাড়া॥

জড়দৈত্যের সাথে অনিবার
চিরসংগ্রাম-ঘোষণা তোমার
লিখিছ ধূলির পটে—
মনোহর রঙে লিপি ভূমিতলে
যুদ্ধের বাণী বিস্তারি চলে
সিন্ধুর তটে তটে।
হে অজেয়, তব রণভূমি-'পরে
সুন্দর তার উৎসব করে,
দক্ষিণবায়ু মর্মরস্বরে
বাজায় কাড়া-নাকাড়া

দোলপূর্ণিমা, ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

বরযাত্রা

পবন দিগন্তের দুয়ার নাড়ে,
চকিত অরণ্যের সুপ্তি কাড়ে।
যেন কোন্ দুর্দম
বিপুল বিহঙ্গম
গগনে মুহুর্মুহু পক্ষ ঝাড়ে॥

পথপাশে মল্লিকা দাঁড়ালো আসি,
বাতাসে সুগন্ধের বাজালো বাঁশি।
ধরার স্বয়ম্বরে
উদার আড়ম্বরে
আসে বর, অম্বরে ছড়ায়ে হাসি॥

অশোক রোমাঞ্চিত মঞ্জরিয়া
দিল তার সঞ্চয় অঞ্জলিয়া।
মধুকরগুঞ্জিত
কিশলয়পুঞ্জিত
উঠিল বনাঞ্চল চঞ্চলিয়া॥

কিংশুককুঙ্কুমে বসিল সেজে,
ধরণীর কিঙ্কিণী উঠিল বেজে।
ইঙ্গিতে সংগীতে
নৃত্যের ভঙ্গীতে
নিখিল তরঙ্গিত উৎসবে যে।

দোলপূর্ণিমা, ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

মাধবী

বসন্তের জয়রবে
দিগন্ত কাঁপিল যবে
মাধবী করিল তার সজ্জা।
মুকুলের বন্ধ টুটে
বাহিরে আসিল ছুটে,
ছুটিল সকল তার লজ্জা।
অজানা পান্থের লাগি
নিশি নিশি ছিল জাগি,
দিনে দিনে ভরেছিল অর্ঘ্য
কাননের এক ভিতে
নিভৃত পরানটিতে
রেখেছিল মাধুরীর স্বর্গ।
ফাল্গুন পবনরথে
যখন বনের পথে
জাগালো মর্মরকলছন্দ
মাধবী সহসা তার
সঁপি দিল উপহার—
রূপ তার, মধু তার, গন্ধ॥

দোলপূর্ণিমা, ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

বিজয়ী

বিবশ দিন, বিরস কাজ,
কে কোথা ছিনু দোঁহে—
সহসা প্রেম আসিলে আজ
কী মহা সমারোহে।
নীরবে রয় অলস মন,
আঁধারময় ভবনকোণ,
ভাঙিলে দ্বার কোন্ সে ক্ষণ,
অপরাজিত ওহে।
সহসা প্রেম আসিলে আজ
বিপুল বিদ্রোহে॥

কানন-'পর ছায়া বুলায়,
ঘনায় ঘনঘটা।
গঙ্গা যেন হেসে দুলায়
ধূর্জটির জটা।
যে যেথা রয় ছাড়িল পথ,
ছুটালে ঐ বিজয়রথ,
আঁখি তোমার তড়িৎবৎ
ঘন ঘুমের মোহে।
সহসা প্রেম আসিলে আজ
বেদনাদান ব'হে॥

বৈশাখ, ১৩৩৩ ?

প্রত্যাশা

প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ-শাখায় ফাগুন মাসে
কী উচ্ছ্বাসে
ক্লান্তিবিহীন ফুল-ফোটানোর খেলা।
ক্ষান্তকূজন শান্ত বিজন সন্ধ্যাবেলা
প্রত্যহ সেই ফুল্ল শিরীষ প্রশ্ন শুধায় আমায় দেখি,
'এসেছে কি।'

আর বছরেই এমনি দিনেই ফাগুন মাসে
কী উল্লাসে
নাচের মাতন লাগল শিরীষ-ডালে
স্বর্গপুরের কোন্ নূপুরের তালে।
প্রত্যহ সেই চঞ্চলপ্রাণ শুধিয়েছিল, 'শুনাও দেখি,
আসে নি কি।'

আবার কখন এমনি দিনেই ফাগুন মাসে
কী বিশ্বাসে
ডালগুলি তার রইবে শ্রবণ পেতে
অলখ জনের চরণ-শব্দে মেতে।
প্রত্যহ তার মর্মরস্বর বলবে আমায় দীর্ঘশ্বাসে,
'সে কি আসে।'

প্রশ্ন জানাই পুষ্পবিভোর ফাগুন মাসে
কী আশ্বাসে,
হায় গো আমার ভাগ্যরাতের তারা,
নিমেষ-গণন হয় না কি মোর সারা।
প্রত্যহ বয় প্রাঙ্গণময় বনের বাতাস এলোমেলো,
'সে কি এল।'

২৩ শ্রাবণ, ১৩৩৫
[চৌরঙ্গি, কলিকাতা]

অর্ঘ্য

সূর্যমুখীর বর্ণে বসন
লই রাঙায়ে,
অরুণ-আলোর ঝংকার মোর
লাগলো গায়ে।
অঞ্চলে মোর কদম ফুলের ভাষা
বক্ষে জড়ায় আসন্ন কোন্ আশা,
কৃষ্ণকলির হেমাঞ্জলির
চঞ্চলতা
কঞ্চুলিকার স্বর্ণলিখায়
মিলায় কথা॥

আজ যেন পায় নয়ন আপন
নতুন জাগা।
আজ আসে দিন প্রথম-দেখার-
দোলন-লাগা।
এই ভুবনের একটি অসীম কোণ,
যুগল প্রাণের গোপন পদ্মাসন,
সেথায় আমায় ডাক দিয়ে যায়
নাই জানা কে
সাগর-পারের পান্থপাখির
ডানার ডাকে॥

চলব ডালায় আলোক-মালায়
প্রদীপ জ্বেলে,
ঝিল্লিঝনন অশোক-তলায়
চমক মেলে।
আমার প্রকাশ নতুন বচন ধ'রে,
আপ্‌নাকে আজ নতুন রচন ক'রে,
ফাগুন-বনের গুপ্ত ধনের
আভাস-ভরা,
রক্তদীপন প্রাণের আভায়
রঙিন-করা॥

চক্ষে আমার জ্বলবে আদিম
অগ্নিশিখা,
প্রথম ধরায় সেই-যে পরায়
আলোর টিকা।
নীরব হাসির সোনার বাঁশির ধ্বনি
করবে ঘোষণ প্রেমের উদ্‌বোধনী—
প্রাণ-দেবতার মন্দির-দ্বার
যাক রে খুলে,
অঙ্গ আমার অর্ঘ্যের থাল
অরূপ ফুলে॥

২৩ শ্রাবণ, ১৩৩৫
[কলিকাতা]

দ্বৈত

আমি যেন গোধূলিগগন
ধেয়ানে মগন,
স্তব্ধ হয়ে ধরাপানে চাই ;
কোথা কিছু নাই,
শুধু শূন্য বিরাট প্রান্তরভূমি।
তারি প্রান্তে নিরালা পিয়ালতরু তুমি
বক্ষে মোর বাহু প্রসারিয়া।
স্তব্ধ হিয়া
শ্যামল স্পর্শনে আত্মহারা,
বিস্মরিল আপনার সূর্য চন্দ্র তারা।

তোমার মঞ্জরী
কভু ফোটে, কভু পড়ে ঝরি ;
তোমার পল্লবদল
কভু স্তব্ধ, কভু-বা চঞ্চল।
একেলার খেলা তব
আমার একেলা বক্ষে নিত্য নব॥

কিশলয়গুলি
কম্পমান করুণ অঙ্গুলি—

চায় সন্ধ্যারক্তরাগ,
আলোর সোহাগ ;
চায় নক্ষত্রের কথা ;
চায় বুঝি মোর নিঃসীমতা

২৩ শ্রাবণ, ১৩৩৫
[কলিকাতা]

সন্ধান

আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়
মনের কথার কুসুমকোরক খোঁজে।
সেথায় কখন অগম গোপন গহন মায়ায়
পথ হারাইল ও-যে।
আতুর দিঠিতে শুধায় সে নীরবেরে—
নিভৃত বাণীর সন্ধান নাই যে রে ;
অজানার মাঝে অবুঝের মতো ফেরে
অশ্রুধারায় ম'জে॥

আমার হৃদয়ে যে কথা লুকানো তার আভাষণ
ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয়তলে ?
দুয়ারে এঁকেছি রক্ত রেখায় পদ্ম-আসন,
সে তোমারে কিছু বলে ?
তব কুঞ্জের পথ দিয়ে যেতে যেতে
বাতাসে বাতাসে ব্যথা দিই মোর পেতে,
বাঁশি কী আশায় ভাষা দেয় আকাশেতে
সে কি কেহ নাহি বোঝে॥

? শ্রাবণ, ১৩৩৫

উপহার

মণিমালা হাতে নিয়ে
দ্বারে গিয়ে
এসেছিনু ফিরে
নতশিরে।
ক্ষণতরে বুঝি
বাহিরে ফিরেছি খুঁজি,
হায় রে বৃথাই,
বাহিরে যা নাই।
ভীরু মন চেয়েছিল ভুলায়ে জিনিতে,
হীরা দিয়ে হৃদয় কিনিতে ॥

এই পণ মোর,
সমস্ত জীবন-ভোর
দিনে দিনে দিব তার হাতে তুলি
স্বর্গের দাক্ষিণ্য হতে আসিবে যে শ্রেষ্ঠ ক্ষণগুলি,
কণ্ঠহারে
গেঁথে দিব তারে
যে দুর্লভ রাত্রি মম
বিকশিবে ইন্দ্রাণীর পারিজাত-সম।
পায়ে দিব তার
যে-এক মুহূর্ত আনে প্রাণের অনন্ত উপহার ॥

২৩ শ্রাবণ, ১৩৩৫
[কলিকাতা]

শুভযোগ

যে সন্ধ্যায় প্রসন্ন লগনে
পূর্ণচন্দ্রে হেরিল গগনে
উৎসুক ধরণী—
সর্বাঙ্গ বেষ্টিয়া তার তরঙ্গের ধন্য-ধন্য ধ্বনি
মন্দ্রিয়া উঠিল কূলে কূলে,
নদীর গদ্‌গদ বাণী অশ্রুবেগে উঠে ফুলে ফুলে
কোটালের বানে,
কী চেয়েছে কী বলেছে আপনি না জানে,
সে সন্ধ্যায় প্রসন্ন লগনে
তোমারে প্রথম দেখা দেখেছি জীবনে ॥

যে বসন্তে উৎকণ্ঠিত দিনে
সাড়া এল চঞ্চল দক্ষিণে,
পলাশের কুঁড়ি
এক রাত্রে বর্ণবহ্নি জ্বালিল সমস্ত বন জুড়ি,
শিমুল পাগল হয়ে মাতে
অজস্র ঐশ্বর্যভার ভরে তার দরিদ্র শাখাতে—
পাত্র করি পুরা
আকাশে আকাশে ঢালে রক্তফেন সুরা,
উচ্ছ্বসিত সে এক নিমেষে
যা-কিছু বলার ছিল বলেছি নিঃশেষে ॥

২৪ শ্রাবণ, ১৩৩৫
চৌরঙ্গি, কলিকাতা

মায়া

চিত্তকোণে ছন্দে তব
বাণীরূপে
সংগোপনে আসন লব
চুপে চুপে।
সেইখানেতেই আমার অভিসার
যেথায় অন্ধকার
ঘনিয়ে আছে চেতন বনের
ছায়াতলে,
যেথায় শুধু ক্ষীণ জোনাকির
আলো জ্বলে—

সেথায় নিয়ে যাব আমার
দীপশিখা,
গাঁথব আলো-আঁধার দিয়ে
মরীচিকা।
মাথা থেকে খোঁপার মালা খুলে
পরিয়ে দেব চুলে—
গন্ধ দিবে সিন্ধুপারের
কুঞ্জবীথির,
আনবে ছবি কোন্ বিদেশের
কী বিস্মৃতির॥

পরশ মম লাগবে তোমার
কেশে বেশে,
অঙ্গে তোমার রূপ নিয়ে গান
উঠবে ভেসে।
ভৈরবীতে উচ্ছল গান্ধার,
বসন্তবাহার,
পুরবী কি ভীমপলাশি
রক্তে দোলে—
রাগ-রাগিণী দুঃখে সুখে
যায়-যে গ'লে ॥

হাওয়ায় ছায়ায় আলোয় গানে
আমরা দোঁহে
আপন-মনে রচব ভুবন
ভাবের মোহে।
রূপের রেখায় মিলবে রসের রেখা,
মায়ার চিত্রলেখা—
বস্তু হতে সেই মায়া তো
সত্যতর,
তুমি আমায় আপনি র'চে
আপন কর ॥

২৪ শ্রাবণ, ১৩৩৫
[কলিকাতা]

নির্ঝরিণী

ঝর্‌না, তোমার স্ফটিক জলের
স্বচ্ছ ধারা—
তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে
সূর্য তারা।
তারি এক ধারে আমার ছায়ারে
আনি মাঝে মাঝে, দুলায়ো তাহারে,
তারি সাথে তুমি হাসিয়া মিলায়ো
কলধ্বনি—
দিয়ো তারে বাণী যে বাণী তোমার
চিরন্তনী॥

আমার ছায়াতে তোমার হাসিতে
মিলিত ছবি,
তাই নিয়ে আজি পরানে আমার
মেতেছে কবি।
পদে পদে তব আলোর ঝলকে
ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে,
মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি,
নির্ঝরিণী।
তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়,
নিজেরে চিনি॥

[আষাঢ়, ১৩৩৫
বাঙ্গালোর]

শুকতারা

সুন্দরী তুমি শুকতারা
সুদূর শৈলশিখরান্তে,
শর্বরী যবে হবে সারা
দর্শন দিয়ো দিক্‌ভ্রান্তে॥

ধরা যেথা অম্বরে মেশে
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র,
আঁধারের বক্ষের 'পরে
আধেক আলোকরেখা-রন্ধ্র॥

আমার আসন রাখে পেতে
নিদ্রাগহন মহাশূন্য,
তন্ত্রী বাজাই স্বপনেতে
তন্দ্রা ঈষৎ করি ক্ষুণ্ন॥

মন্দচরণে চলি পারে,
যাত্রা হয়েছে মোর সাঙ্গ।
সুর থেমে আসে বারে বারে,
ক্লান্তিতে আমি অবশাঙ্গ॥

সুন্দরী ওগো শুকতারা,
রাত্রি না যেতে এসো তূর্ণ।
স্বপ্নে যে বাণী হল হারা
জাগরণে করো তারে পূর্ণ॥

নিশীথের তল হতে তুলি
লহো তারে প্রভাতের জন্য।
আঁধারে নিজেরে ছিল ভুলি,
আলোকে তাহারে করো ধন্য

যেখানে সুপ্তি হল লীনা,
যেথা বিশ্বের মহামন্দ্র,
অর্পিনু সেথা মোর বীণা
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র॥

২৩ জুন, ১৯২৮
আষাঢ়, ১৩৩৫
বাঙ্গালোর

প্রকাশ

আচ্ছাদন হতে
ডেকে লহো মোরে তব চক্ষুর আলোতে।
অজ্ঞাত ছিলাম এত দিন
পরিচয়হীন—
সেই অগোচরদুঃখভার
বহিয়া চলেছি পথে ; শুধু আমি অংশ জনতার।
উদ্ধার করিয়া আনো,
আমারে সম্পূর্ণ করি জানো।
যেথা আমি একা
সেথায় নামুক তব দেখা।
সে মহানির্জন
যে গহনে অন্তর্যামী পাতেন আসন
সেইখানে আনো আলো,
দেখো মোর সব মন্দ ভালো,
যাক লজ্জা ভয়—
আমার সমস্ত হোক তব দৃষ্টিময়॥

ছায়া আমি সবা-কাছে, অস্ফুট আমি-যে,
তাই আমি নিজে
তাহাদের মাঝে
নিজেরে খুঁজিয়া পাই না-যে।
তারা মোর নাম জানে, নাহি জানে মান ;
তারা মোর কর্ম জানে, নাহি জানে মর্মগত প্রাণ।
সত্য যদি হই তোমা-কাছে
তবে মোর মূল্য বাঁচে—
তোমার মাঝারে
বিধির স্বতন্ত্র সৃষ্টি জানিব আমারে।
প্রেম তব ঘোষিবে তখন—
অসংখ্য যুগের আমি একান্ত সাধন।
তুমি মোরে করো আবিষ্কার,
পূর্ণ ফল দেহো মোরে আমার আজন্ম প্রতীক্ষার
বহিতেছি অজ্ঞাতির বন্ধন সদাই,
মুক্তি চাই
তোমার জানার মাঝে
সত্য তব যেথায় বিরাজে॥

২৪ শ্রাবণ, ১৩৩৫
[কলিকাতা]

বরণডালা

আজি এ নিরালা কুঞ্জে, আমার
অঙ্গমাঝে
বরণের ডালা সেজেছে আলোক-
মালার সাজে।
নব বসন্তে লতায় লতায়
পাতায় ফুলে
বাণীহিল্লোল উঠে প্রভাতের
স্বর্ণকূলে,
আমার দেহের বাণীতে সে দোল
উঠিছে দুলে,
এ বরণ-গান নাহি পেলে মান
মরিব লাজে—
ওহে প্রিয়তম, দেহে মনে মম
ছন্দ বাজে॥

অর্ঘ্য তোমার আনি নি ভরিয়া
বাহির হতে,
ভেসে আসে পূজা পূর্ণ প্রাণের
আপন স্রোতে।
মোর তনুময় উছলে হৃদয়
বাঁধন-হারা,
অধীরতা তারি মিলনে তোমারি
হোক-না সারা।

ঘন যামিনীর আঁধারে যেমন
ঝলিছে তারা
দেহ ঘেরি মম প্রাণের চমক
তেমনি রাজে—
সচকিত আলো নেচে ওঠে মোর
সকল কাজে ॥

২৫ শ্রাবণ, ১৩৩৫

মুক্তি

ভোরের পাখি নবীন আঁখিছুটি
পুরানো মোর স্বপন-ডোর
ছিঁড়িল কুটি কুটি।
রুদ্ধ মন গগনে গেল খুলি,
বিজুলি হানি দৈববাণী
বক্ষে উঠে ছুলি।
ঘাসের ছোঁওয়া তৃণশয়ন-ছায়ে
মাটির যেন মর্মকথা বুলায়ে দিল গায়ে ;
আমের বোল, ঝাউয়ের দোল,
ঢেউয়ের লুটোপুটি,
মিলি সকলে কী কোলাহলে
বক্ষে এল জুটি॥

ভোরের পাখি নবীন আঁখিছুটি
গুহাবিহারী ভাবনা যত
নিমেষে নিল লুটি।
কী ইঙ্গিতে আচম্বিতে
ডাকিল লীলাভরে
ছুয়ার-খোলা পুরানো খেলাঘরে—

যেখানে ব'সে সবার কাছাকাছি
অজানা ভাবে অবুঝ গান
একদা গাহিয়াছি।
প্রাণের মাঝে ছুটে-চলার
খ্যাপামি এল ছুটি—
লাভের লোভ, ক্ষতির ক্ষোভ,
সকলি গেল টুটি॥

ভোরের পাখি নবীন আঁখিদুটি
শুকতারাকে যেমনি ডাকে
প্রাণে সে উঠে ফুটি।
অরুণ-রাঙা চেতনা জাগে চিতে-
ঝুমকোলতা জানায় কথা
রঙিন রাগিণীতে।
মনের 'পরে খেলায় বায়ুবেগে
কত-যে মায়া-রঙের ছায়া
খেয়ালে-পাওয়া মেঘে ;
বুলায় বুকে ম্যাগ্‌নোলিয়া
কৌতূহলী মুঠি,
অতি বিপুল ব্যাকুলতায়
নিখিলে জেগে উঠি॥

২৭ শ্রাবণ, ১৩৩৫

উদ্‌ঘাত

অজানা জীবন বাহিনু,
রহিনু আপন-মনে,
গোপন করিতে চাহিনু—
ধরা দিনু দু'নয়নে।
কী বলিতে পাছে কী বলি
তাই দূরে ছিনু কেবলি,
তুমি কেন এসে সহসা
দেখে গেলে আঁখিকোণে
কী আছে আমার মনে॥

গভীর তিমিরগহনে
আছিনু নীরব বিরহে,
হাসির তড়িৎ-দহনে
লুকানো সে আর কি রহে।
দিন কেটেছিল বিজনে
ধেয়ানের ছবি-সৃজনে,
আনমনে যেই গেয়েছি
শুনে গেছ সেই খনে
কী আছে আমার মনে॥

প্রবেশিলে মোর নিভৃতে,
দেখে নিলে মোরে কী ভাবে—
যে দীপ জ্বেলেছি নিশীথে
সে দীপ কি তুমি নিভাবে।
ছিল ভরি মোর থালিকা,
ছিঁড়িব কি সেই মালিকা।
শরম দিবে কি তাহারে—
অকথিত নিবেদনে
যা আছে আমার মনে

২৭ শ্রাবণ, ১৩৩৫

অসমাপ্ত

বোলো তারে, বোলো,
এতদিনে তারে দেখা হল।
তখন বর্ষণশেষে
ছুঁয়েছিল রৌদ্র এসে
উন্মীলিত গুল্‌মোরের থোলো।
বনের মন্দিরমাঝে
তরুর তম্বুরা বাজে,
অনন্তের উঠে স্তবগান—
চক্ষে জল ব'হে যায়,
নম্র হল বন্দনায়
আমার বিস্মিত মনপ্রাণ॥

দেবতার বর—
কত জন্ম, কত জন্মান্তর
অব্যক্ত ভাগ্যের রাতে
লিখিছে আকাশ-পাতে
এ দেখার আশ্বাস-অক্ষর।
অস্তিত্বের পারে পারে
এ দেখার বারতারে
বহিয়াছি রক্তের প্রবাহে।
দূর শূন্যে দৃষ্টি রাখি
আমার উন্মনা আঁখি
এ দেখার গূঢ় গান গাহে॥

বোলো আজি তারে—
‘চিনিলাম তোমারে আমারে।
হে অতিথি, চুপে চুপে
বারম্বার ছায়ারূপে
এসেছ কম্পিত মোর দ্বারে।
কত রাত্রে চৈত্রমাসে
প্রচ্ছন্ন পুষ্পের বাসে
কাছে-আসা নিশ্বাস তোমার
স্পন্দিত করেছে, জানি,
আমার গুণ্ঠনখানি—
কাঁদায়েছে সেতারের তার।’

বোলো তারে আজ,
‘অন্তরে পেয়েছি বড়ো লাজ।
কিছু হয় নাই বলা,
বেধে গিয়েছিল গলা,
ছিল না দিনের যোগ্য সাজ।
আমার বক্ষের কাছে
পূর্ণিমা লুকানো আছে,
সেদিন দেখেছ শুধু অমা।
দিনে দিনে অর্ঘ্য মম
পূর্ণ হবে, প্রিয়তম—
আজি মোর দৈন্য কোরো ক্ষমা

২৭ শ্রাবণ, ১৩৩৫

নিবেদন

অজানা খনির নূতন মণির
গেঁথেছি হার,
ক্লান্তিবিহীনা নবীনা বীণায়
বেঁধেছি তার।
যেমন নূতন বনের দুকূল
যেমন নূতন আমের মুকুল
মাঘের অরুণে খোলে স্বর্গের
নূতন দ্বার—
তেমনি আমার নবীন রাগের
নব যৌবনে নব সোহাগের
রাগিণী রচিয়া উঠিল নাচিয়া
বীণার তার॥

যে বাণী আমার কখনো কারেও
হয় নি বলা
তাই দিয়ে গানে রচিব নূতন
নৃত্যকলা।

আজি অকারণমুখর বাতাসে
যুগান্তরের সুর ভেসে আসে,
মর্মরস্বরে বনের ঘুচিল
মনের ভার—
যেমনি ভাঙিল বাণীর বন্ধ
উচ্ছ্বসি উঠে নূতন ছন্দ,
সুরের সাহসে আপনি চকিত
বীণার তার ॥

২৭ শ্রাবণ, ১৩৩৫

অচেনা

রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী করে
যতক্ষণ চিনি নাই তোরে।
কোন্ অন্ধক্ষণে
বিজড়িত তন্দ্রাজাগরণে
রাত্রি যবে সবে হয় ভোর,
মুখ দেখিলাম তোর।
চক্ষু'পরে চক্ষু রাখি শুধালেম, কোথা সংগোপনে
আছ আত্মবিস্মৃতির কোণে॥

তোর সাথে চেনা
সহজে হবে না—
কানে-কানে মৃদুকণ্ঠে নয়।
করে নেব জয়
সংশয়কুণ্ঠিত তোর বাণী;
দৃপ্ত বলে লব টানি
শঙ্কা হতে, লজ্জা হতে, দ্বিধাদ্বন্দ্ব হতে
নির্দয় আলোতে।
জাগিয়া উঠিবি অশ্রুধারে,
মুহূর্তে চিনিবি আপনারে;
ছিন্ন হবে ডোর—
তোমার মুক্তিতে তবে মুক্তি হবে মোর॥

হে অচেনা,
দিন যায়, সন্ধ্যা হয়, সময় রবে না ;
মহা-আকস্মিক
বাধাবন্ধ ছিন্ন করি দিক্‌,
তোমারে চেনার অগ্নি দীপ্তশিখা উঠুক উজ্জ্বলি-
দিব তাহে জীবন-অঞ্জলি ॥

আষাঢ়, ১৩৩৫
[বাঙ্গালোর]

অপরাজিত

ফিরাবে তুমি মুখ,
ভেবেছ মনে আমারে দিবে দুখ ?
আমি কি করি ভয়।
জীবন দিয়ে তোমারে প্রিয়ে, করিব আমি জয়।
বিঘ্নভাঙা যৌবনের ভাষা,
অসীম তার আশা,
বিপুল তার বল,
তোমার আঁখি-বিজুলি-ঘাতে হবে না নিষ্ফল ॥

বিমুখ মেঘ ফিরিয়া যায় বৈশাখের দিনে,
অরণ্যেরে যেন সে নাহি চিনে।
ধরে না কুঁড়ি কানন জুড়ি, ফোটে না বটে ফুল,
মাটির তলে তৃষিত তরুমূল ;
ঝরিয়া পড়ে পাতা,
বনস্পতি তবুও তুলি মাথা
নিঠুর তপে মন্ত্র জপে নীরব অনিমেষে
দহনজয়ী সন্ন্যাসীর বেশে।
দিনের পরে যায় রে দিন, রাতের পরে রাতি—
শ্রবণ রহে পাতি।
কঠিনতর যবে সে পণ দারুণ উপবাসে
এমন কালে হঠাৎ কবে আসে
উদার অকৃপণ
আষাঢ় মাসে সজল শুভখন—

পূর্বগিরি-আড়াল হতে বাড়ায় তার পাণি ;
'করিয়ো ক্ষমা' 'করিয়ো ক্ষমা' গুমরি উঠে বাণী ;
নমিয়া পড়ে নিবিড় মেঘরাশি ;
অশ্রুবারিবন্যা নামে, ধরণী যায় ভাসি ॥

ফিরালে মোরে মুখ !
এ শুধু মোরে ভাগ্য করে ক্ষণিক কৌতুক।
তোমার প্রেমে আমার অধিকার
অতীত যুগ হতে সে জেনো লিখন বিধাতার।
অচলগিরিশিখর-'পরে সাগর করে দাবি,
ঝর্‌না পড়ে নাবি ;
সুদূর দিক্-রেখার পানে চায়,
অকূল অজানায়,
শঙ্কাভরে তরল স্বরে কহে
'নহে গো নহে নহে' ;
এড়ায়ে যাবে বলি
কত-না আঁকা-বাঁকার পথে চলে সে ছলছলি ;
বিপুলতর হয় সে ধারা গভীরতর সুরে
যতই আসে দূরে।
উদারহাসি সাগর সহে অবুঝ অবহেলা—
একদা শেষে পলাতকার খেলা
বক্ষে তার মিলায় কবে, মিলনে হয় সারা—
পূর্ণ হয় নিবেদনের ধারা ॥

২৮ শ্রাবণ, ১৩৩৫

নির্ভয়

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা
গড়িব না ধরণীতে
মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে,
ভাগ্যের পায়ে দুর্বলপ্রাণে
ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়—
তুমি আছ, আমি আছি॥

উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথমাঝে
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব—
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি,
ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব—
তুমি আছ, আমি আছি॥

দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ,
দোঁহারে দেখেছি দোঁহে—
মরুপথতাপ দুজনে নিয়েছি সহে।
ছুটি নি মোহন-মরীচিকা-পিছে-পিছে,
ভুলাই নি মন সত্যেরে করি মিছে—
এই গৌরবে চলিব এ ভবে
যতদিন দোঁহে বাঁচি।
এ বাণী প্রেয়সী, হোক মহীয়সী—
তুমি আছ, আমি আছি॥

৩১ শ্রাবণ, ১৩৩৫

পথের বাঁধন

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চল্‌তি হাওয়ার পন্থী।
রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল,
ওড়্‌না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগঙ্গনার নৃত্য,
হঠাৎ-আলোর ঝল্‌কানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত॥

নাই আমাদের কনকচাঁপার কুঞ্জ,
বনবীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ।
হঠাৎ কখন্‌ সন্ধ্যাবেলায়
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়,
প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে
অরুণকিরণে তুচ্ছ
উদ্ধত যত শাখার শিখরে
রডোডেনড্রন্‌-গুচ্ছ

নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন,
নাই রে ঘরের লালনললিত যত্ন।
পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়,
বন্ধন তারে করি না খাঁচায়,
ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের
কূজনে দুজনে তৃপ্ত।
আমরা চকিত অভাবনীয়ের
ক্বচিৎ-কিরণে দীপ্ত॥

আষাঢ়, ১৩৩৫
[বাঙ্গালোর]

দূত

ছিনু আমি বিষাদে মগনা

অন্যমনা

তোমার বিচ্ছেদ-অন্ধকারে।

হেনকালে নির্জন কুটিরদ্বারে

অকস্মাৎ

কে করিল করাঘাত,

কহিল গম্ভীর কণ্ঠে, অতিথি এসেছি, দ্বার খোলো॥

মনে হল,

ঐ যেন তোমারি স্বর শুনি,

ঐ যেন দক্ষিণবায়ু দূরে ফেলি মদির ফাল্গুনী

দিগন্তে আসিল পূর্বদ্বারে,

পাঠালো নির্ঘোষ তার বজ্রধ্বনিমন্দ্রিত মল্লারে।

কেঁপেছিল বক্ষতল,

বিলম্ব করি নি তবু অর্ধ পল॥

মুহূর্তে মুছিনু অশ্রুবারি,

বিরহিণী নারী,

ছাড়িনু ধেয়ান তব তোমারি সম্মানে—

ছুটে গেনু দ্বারপানে।

শুধালেম, তুমি দূত কার।
সে কহিল, আমি তো সবার॥

যে ঘরে তোমার শয্যা একদিন পেতেছি আদরে
ডাকিলাম তারে সেই ঘরে।
আনিলাম অর্ঘ্যথালি,
দীপ দিনু জ্বালি।
দেখিলাম, বাঁধা তারি ভালে
যে মালা পরায়েছিনু তোমারেই বিদায়ের কালে॥

৪ ভাদ্র, ১৩৩৫
[কলিকাতা]

পরিচয়

তখন বর্ষণহীন অপরাহ্ণমেঘে
শঙ্কা ছিল জেগে ;
ক্ষণে ক্ষণে তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনায়
বায়ু হেঁকে যায় ;
শূন্যে যেন মেঘচ্ছিন্ন রৌদ্ররাগে পিঙ্গল জটায়
দুর্বাসা হানিছে ক্রোধ রক্তচক্ষুকটাক্ষচ্ছটায় ॥

সে দুর্যোগে এনেছিনু তোমার বৈকালী
কদম্বের ডালি।
বাদলের বিষণ্ণ ছায়াতে
গীতহারা প্রাতে
নৈরাশ্যজয়ী সে ফুল রেখেছিল কাজল প্রহরে
রৌদ্রের স্বপনছবি রোমাঞ্চিত কেশরে কেশরে ॥

মন্থর মেঘেরে যবে দিগন্তে ধাওয়ায়
পুবন হাওয়ায়,
কাঁদে বন শ্রাবণের রাতে
প্লাবনের ঘাতে,
তখনো নির্ভীক নীপ গন্ধ দিল পাখির কুলায়ে—
বৃন্ত ছিল ক্লান্তিহীন, তখনো সে পড়ে নি ধুলায়।
সেই ফুলে দৃঢ় প্রত্যাশার
দিনু উপহার ॥

সজল সন্ধ্যায় তুমি এনেছিলে সখী,
একটি কেতকী।
তখনো হয় নি দীপ জ্বালা,
ছিলাম নিরালা।
সারি-দেওয়া সুপারির আন্দোলিত সঘন সবুজে
জোনাকি ফিরিতেছিল অবিশ্রান্ত কারে খুঁজে খুঁজে॥

দাঁড়াইলে দুয়ারের বাহিরে আসিয়া
গোপনে হাসিয়া।
শুধালেম আমি কৌতূহলী
'কী এনেছ' বলি।
পাতায় পাতায় বাজে ক্ষণে ক্ষণে বারিবিন্দুপাত,
গন্ধঘন প্রদোষের অন্ধকারে বাড়াইনু হাত॥

ঝংকারি উঠিল মোর অঙ্গ আচম্বিতে
কাঁটার সংগীতে।
চমকিনু কী তীব্র হরষে
পরুষ পরশে।
সহজসাধনলব্ধ নহে সে মুগ্ধের নিবেদন—
অন্তরে ঐশ্বর্যরাশি, আচ্ছাদনে কঠোর বেদন।
নিষেধে নিরুদ্ধ যে সম্মান
তাই তব দান॥

৪ ভাদ্র, ১৩৩৫
[চৌরঙ্গি, কলিকাতা]

দায়মোচন

চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাঙাল—
এ কথা বলিতে চাও বোলো।
এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল—
তার পরে যদি তুমি ভোলো
মনে করাব না আমি শপথ তোমার,
আসা যাওয়া দু দিকেই খোলা রবে দ্বার,
যাবার সময় হলে যেয়ো সহজেই,
আবার আসিতে হয় এসো।
সংশয় যদি রয় তাহে ক্ষতি নেই,
তবু ভালোবাস যদি বেসো॥

বন্ধু, তোমার পথ সম্মুখে জানি,
পশ্চাতে আমি আছি বাঁধা।
অশ্রুনয়নে বৃথা শিরে কর হানি
যাত্রায় নাহি দিব বাধা।
আমি তব জীবনের লক্ষ্য তো নহি,
ভুলিতে ভুলিতে যাবে হে চিরবিরহী—
তোমার যা দান তাহা রহিবে নবীন
আমার স্মৃতির আঁখিজলে,
আমার যা দান সেও জেনো চিরদিন
রবে তব বিস্মৃতিতলে॥

দূরে চলে যেতে যেতে দ্বিধা করি মনে
যদি কভু চেয়ে দেখ ফিরে
হয়তো দেখিবে, আমি শূন্য শয়নে,
নয়ন সিক্ত আঁখিনীরে।
উপেক্ষা কর যদি পাব তবে বল,
করুণা করিলে নাহি ঘোচে আঁখিজল—
সত্য যা দিয়েছিলে থাক্ মোর তাই,
দিবে লাজ তার বেশি দিলে।
দুঃখ বাঁচাতে যদি কোনোমতে চাই
দুঃখের মূল্য না মিলে॥

দুর্বল ম্লান করে নিজ অধিকার
বরমাল্যের অপমানে—
যে পারে সহজে নিতে যোগ্য সে তার,
চেয়ে নিতে সে কভু না জানে।
প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে মিশাব না ফাঁকি,
সীমারে মানিয়া তার মর্যাদা রাখি—
যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন,
যা পাই নি বড়ো সেই নয়।
চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন
চিরবিচ্ছেদ করি জয়॥

৭ ভাদ্র, ১৩৩৫

সবলা

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা।
নত করি মাথা
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি
ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে।
শুধু শূন্যে চেয়ে রব? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ।
কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্গা-পাশে।
দুর্জয় আশ্বাসে
দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি পণ॥

যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী—
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।
বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন,
সে লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণদীপ্তি গোধূলিতে।
কভু তারে দিব না ভুলিতে
মোর দৃপ্ত কঠিনতা।

বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার—
ফেলে দেব আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার ॥

দেখা হবে ক্ষুব্ধসিন্ধুতীরে—
তরঙ্গগর্জনোচ্ছ্বাস মিলনের বিজয়ধ্বনিরে
দিগন্তের বক্ষে নিক্ষেপিবে।
মাথার গুণ্ঠন খুলি কব তারে, মর্তে বা ত্রিদিবে
একমাত্র তুমিই আমার।
সমুদ্রপাখির পক্ষে সেই ক্ষণে উঠিবে হুংকার
পশ্চিম পবন হানি,
সপ্তর্ষি-আলোকে যবে যাবে তারা পন্থা অনুমানি

হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা,
রক্তে মোর জাগে রুদ্র বীণা।
উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের 'পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হতে
নির্বারিত স্রোতে।
যাহা মোর অনির্বচনীয়
তারে যেন চিত্তমাঝে পায় মোর প্রিয়।
সময় ফুরায় যদি, তবে তার পরে
শান্ত হোক সে নির্ঝর নৈঃশব্দ্যের নিস্তব্ধ সাগরে ॥

৭ ভাদ্র, ১৩৩৫

প্রতীক্ষা

তোমার প্রত্যাশা লয়ে আছি প্রিয়তমে,
চিত্ত মোর তোমারে প্রণমে।
অয়ি অনাগতা, অয়ি নিত্যপ্রত্যাশিতা,
হে সৌভাগ্যদায়িনী দয়িতা,
সেবাকক্ষে করি না আহ্বান—
শুনাও তাহারি জয়গান
যে বীর্য বাহিরে ব্যর্থ, যে ঐশ্বর্য ফিরে অবাঞ্ছিত,
চাটুলুব্ধ জনতায় যে তপস্যা নির্মম লাঞ্ছিত॥

দীর্ঘ এ দুর্গম পথ মধ্যাহ্নতাপিত,
অনিদ্রায় রজনী যাপিত।
শুষ্কবাক্যবালুকার ঘূর্ণিপাক-ঝড়ে
পথিক ধুলায় শুয়ে পড়ে।
নাহি চাহি মধুর শুশ্রূষা—
হে কল্যাণী, তুমি নিষ্কলুষা
তোমার প্রবল প্রেম প্রাণভরা সৃষ্টির নিশ্বাস
উদ্দীপ্ত করুক চিত্তে ঊর্ধ্বশিখা বিপুল বিশ্বাস॥

ধূসর প্রদোষে আজি অস্তপথ জুড়ে
নিশাচরী মিথ্যা চলে উড়ে।
আলো-আঁধারের পাকে রচে একি মায়া,
হ্রস্ব যারা ধরে দীর্ঘ ছায়া।

যাচে দেশ মোহের দীক্ষারে,
কাঁদে দিক্ বিধির ধিক্কারে,
ভাগ্যের ভিক্ষুক চাহে কুটিল সিদ্ধির আশীর্বাদ—
ধূলিতে-খুঁটিয়া-তোলা বহুজন-উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ॥

কুৎসায় বিস্তারি দেয় পঙ্কে-ক্লিন্ন গ্লানি,
কলহেরে শৌর্য ব'লে জানি।
ভাবি, দুর্যোগের সিন্ধু তরিব হেলায়
বঞ্চনার ভঙ্গুর ভেলায়।
বাহিরে মুক্তিরে ব্যর্থ খুঁজি,
অন্তরে বন্ধন করি পুঁজি—
অশক্তি মজ্জায় রক্তে, শক্তি বলি জানি ছলনাকে।
মর্মগত খর্বতায় সর্বকালে খর্ব করি রাখে ॥

হে বাণীরূপিণী, বাণী জাগাও অভয়,
কুজ্ঝটিকা চিরসত্য নয়।
চিত্তেরে তুলুক ঊর্ধ্বে মহত্ত্বের পানে
উদাত্ত তোমার আত্মদানে।
হে নারী, হে আত্মার সঙ্গিনী,
অবসাদ হতে লহো জিনি—
স্পর্ধিত কুশ্রীতা নিত্য যতই করুক সিংহনাদ,
হে সতী সুন্দরী, আনো তাহার নিঃশব্দ প্রতিবাদ

১ ভাদ্র, ১৩৩৫

লগ্ন

প্রথম মিলনদিন, সে কি হবে নিবিড় আষাঢ়ে,
যেদিন গৈরিকবস্ত্র ছাড়ে
আসন্নের আশ্বাসে সুন্দরা
বসুন্ধরা।
প্রাঙ্গণের চারি ধার ঢাকিয়া সজল আচ্ছাদনে
যেদিন সে বসে প্রসাধনে
ছায়ার আসন মেলি ;
পরি লয় নূতন সবুজরঙা চেলি,
চক্ষুপাতে লাগায় অঞ্জন,
বক্ষে করে কদম্বের কেশর রঞ্জন ;
দিগন্তের অভিষেকে
বাতাস অরণ্যে ফিরি নিমন্ত্রণ যায় হেঁকে হেঁকে।
যেদিন প্রণয়ীবক্ষতলে
মিলনের পাত্রখানি ভরে অকারণ অশ্রুজলে,
কবির সংগীত বাজে গভীর বিরহে।—
নহে নহে, সেদিন তো নহে॥

সে কি তবে ফাল্গুনের দিনে,
যেদিন বাতাস ফিরে গন্ধ চিনে চিনে
সবিস্ময়ে বনে বনে ;
শুধায় সে মল্লিকারে কাঞ্চন-রঙ্গনে,
তুমি কবে এলে।

নাগকেশরের কুঞ্জ কেশর ধুলায় দেয় ফেলে,
ঐশ্বর্যগৌরবে।
কলরবে
অজস্র মিশায় বিহঙ্গম
ফুলের বর্ণের রঙ্গে ধ্বনির সংগম ;
অরণ্যের শাখায় শাখায়
প্রজাপতিসংঘ আনে পাখায় পাখায়
বসন্তের বর্ণমালা চিত্রল অক্ষরে ;
ধরণী যৌবনগর্বভরে
আকাশেরে নিমন্ত্রণ করে যবে
উদ্দাম উৎসবে ;
কবির বীণার তন্ত্র যে বসন্তে ছিঁড়ে যেতে চাহে
প্রমত্ত উৎসাহে।
আকাশে বাতাসে
বর্ণের গন্ধের উচ্ছহাসে
ধৈর্য নাহি রহে।—
নহে নহে, সেদিন তো নহে॥

যেদিন আশ্বিনে শুভক্ষণে
আকাশের সমারোহ ধরণীতে পূর্ণ হল ধনে।
সঘনশস্পিত তট লভিল সঙ্গিনী
তরঙ্গিণী—
তপস্বিনী সে-যে, তার গম্ভীর প্রবাহে
সমুদ্রবন্দনাগান গাহে।

মুছিয়াছে নীলাম্বর বাষ্পসিক্ত চোখ,
বন্ধমুক্ত নির্মল আলোক।
বনলক্ষ্মী শুভব্রতা
শুভ্রের ধেয়ানে তার মেলিয়াছে অম্লান শুভ্রতা
আকাশে আকাশে
শেফালি মালতী কুন্দে কাশে।
অপ্রগল্‌ভা ধরিত্রী-সে প্রণামে লুণ্ঠিত,
পূজারিনী নিরবগুণ্ঠিত ;
আলোকের আশীর্বাদে শিশিরের স্নানে
দাহহীন শান্তি তার প্রাণে।
দিগন্তের পথ বাহি
শূন্যে চাহি
রিক্তবিত্ত শুভ্র মেঘ সন্ন্যাসী উদাসী
গৌরীশঙ্করের তীর্থে চলিল প্রবাসী।
সেই স্নিগ্ধ ক্ষণে, সেই স্বচ্ছ সূর্যকরে,
পূর্ণতায়-গম্ভীর অম্বরে,
মুক্তির শান্তির মাঝখানে
তাহারে দেখিব যারে চিত্ত চাহে, চক্ষু নাহি জানে

৩ ভাদ্র, ১৩৩৫

সাগরিকা

সাগরজলে সিনান করি সজল এলোচুলে
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে।
শিথিল পীতবাস
মাটির 'পরে কুটিলরেখা লুটিল চারি পাশ।
নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে
চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।
মকরচূড় মুকুটখানি পরি ললাট'পরে
ধনুকবাণ ধরি দখিন করে
দাঁড়ানু রাজবেশী ;
কহিনু, 'আমি এসেছি পরদেশী।'

চমকি ত্রাসে দাঁড়ালে উঠি শিলা-আসন ফেলে ;
শুধালে, 'কেন এলে।'
কহিনু আমি, 'রেখো না ভয় মনে,
পূজার ফুল তুলিতে চাহি তোমার ফুলবনে।'
চলিলে সাথে, হাসিলে অনুকূল ;
তুলিনু যূথী, তুলিনু জাতী, তুলিনু চাঁপা ফুল।
দুজনে মিলি সাজায়ে ডালি বসিনু একাসনে,
নটরাজেরে পুজিনু একমনে।

কুহেলি গেল, আকাশে আলো দিল-যে পরকাশি
ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি ॥

সন্ধ্যাতারা উঠিল যবে গিরিশিখর-'পরে
একেলা ছিলে ঘরে।
কটিতে ছিল নীল দুকূল, মালতীমালা মাথে,
কাঁকন-দুটি ছিল দুখানি হাতে।
চলিতে পথে বাজায়ে দিনু বাঁশি,
'অতিথি আমি' কহিনু দ্বারে আসি।
তরাসভরে চকিত করে প্রদীপখানি জ্বেলে
চাহিলে মুখে ; কহিলে, 'কেন এলে।'
কহিনু আমি, 'রেখো না ভয় মনে,
তনু দেহটি সাজাব তব আমার আভরণে।'
চাহিলে হাসিমুখে,
আধো-চাঁদের কনকমালা দোলানু তব বুকে।
মকরচূড় মুকুটখানি কবরী তব ঘিরে
পরায়ে দিনু শিরে।
জ্বালায়ে বাতি মাতিল সখীদল,
তোমার দেহে রতনসাজ করিল ঝলমল্।
মধুর হল, বিধুর হল মাধবী নিশীথিনী,
আমার তালে তোমার নাচে মিলিল রিনিঝিনি।
পূর্ণচাঁদ হাসে আকাশ-কোলে,
আলোকছায়া শিবশিবানী সাগরজলে দোলে ॥

ফুরালো দিন কখন নাহি জানি,
সন্ধ্যাবেলা ভাসিল জলে আবার তরীখানি।
সহসা বায়ু বহিল প্রতিকূলে,
প্রলয় এল সাগরতলে দারুণ ঢেউ তুলে।
লবণজলে ভরি
আঁধার রাতে ডুবালো মোর রতন-ভরা তরী॥

আবার ভাঙা ভাগ্য নিয়ে দাঁড়ানু দ্বারে এসে
ভূষণহীন মলিনদীন বেশে।
দেখিনু আমি নটরাজের দেউলদ্বার খুলি,
তেমনি করে রয়েছে ভরে ডালিতে ফুলগুলি।
হেরিনু রাতে, উতল উৎসবে
তরল কলরবে
আলোর নাচ নাচায় চাঁদ সাগরজলে যবে
নীরব তব নম্র নত মুখে
আমারই আঁকা পত্রলেখা, আমারই মালা বুকে।
দেখিনু চুপে চুপে,
আমারই বাঁধা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে
অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে
ললিতগীতকলিত কল্লোলে॥

মিনতি মম শুন হে সুন্দরী,
আরেক বার সমুখে এসো প্রদীপখানি ধরি
এবার মোর মকরচূড় মুকুট নাহি মাথে,
ধনুকবাণ নাহি আমার হাতে—

এবার আমি আনি নি ডালি দখিনসমীরণে
সাগরকূলে তোমার ফুলবনে।
এনেছি শুধু বীণা,
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কি না।

১ অক্টোবর, ১৯২৭
মায়ার জাহাজ

বরণ

পুরাণে বলেছে,
একদিন নিয়েছিল বেছে
স্বয়ম্বরসভাঙ্গনে দময়ন্তী সতী
নল-নরপতি—
ছদ্মবেশী দেবতার মাঝে।
অর্ঘ্যহারা দেবতারা চলে গেল লাজে।
দেবমূর্তি চিনেছে সেদিন,
তারা যে ফেলে না ছায়া, তারা অমলিন।
সেদিন স্বর্গের ধৈর্য গেল টুটি,
ইন্দ্রলোক করিল ভ্রূকুটি॥

তাই শুনে কতদিন একা বসে বসে
ভেবেছিনু বালিকাবয়সে—
আমি হব স্বয়ম্বরা বিশ্বসভাতলে,
দেবতারই গলে
দিব মালা তপস্বিনী,
মানবের মাঝখানে একদিন লব তারে চিনি।
তারি লাগি সর্ব দেহে মনে
দিনে দিনে বরমাল্য গাঁথিব যতনে॥

কঠিন সে পণ,
ভাবি নি কেমনে তারে করিব সাধন।

মানুষ-যে দেশে দেশে
কত ফেরে দেবতার ছদ্মবেশে।
ললাটে তিলক কারো লেখা,
দেখিতে দেখিতে ওঠে কালো হয়ে তার স্বর্ণরেখা।
কারো-বা কটিতে বাঁধা শরশূন্য তূণ ;
কেহ করে বজ্রধ্বনি, নাহি তাহে বজ্রের আগুন।
বাতায়নে বসে থাকি,
কতদিন কী দেখিয়া আশ্বাসে চমকি উঠে আঁখি—
চেয়ে চেয়ে দ্বিধা লাগে শেষে,
বৃষ্টি হতে হতে দেখি শিলা পড়ে এসে॥

একদিন রৌদ্রের বেলায়
মধ্যাহ্নের জনতার মুখর মেলায়
রাজপথপাশে
দাঁড়াইনু— দেখিলাম, যারা যায় আসে
তাহাদের কায়া
সম্মুখে ফেলিয়া চলে দীর্ঘতর ছায়া।
শুনিলাম, স্পর্ধাতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর
ছিন্ন ক'রে দিতে চাহে দেবতার অখণ্ড অম্বর।
উজ্জ্বল সজ্জায়
দীন অঙ্গ সমাচ্ছন্ন ধনের লজ্জায়।
ছুটে চলে অশ্বরথ,
তার চেয়ে আড়ম্বরে সঙ্গে ওড়ে ধূলির পর্বত॥

যখন সেদিন সেই ঊর্ধ্বশ্বাস লুব্ধ ঠেলাঠেলি
নানা শব্দে উঠিছে উদ্বেলি

তুমি, দেখি, পথপ্রান্তে একা হাস্যমুখে
নিঃশব্দ কৌতুকে
চেয়ে আছ— হৃদয় আছিল জনস্রোতে,
মন ছিল দূরে সবা হতে।
তুমি যেন মহাকালসমুদ্রের তটে
নিত্যের নিশ্চলচিত্তপটে
দেখেছিলে চঞ্চলের চলমান ছবি,
শুনেছিলে ভৈরবের ধ্যানমাঝে উমার ভৈরবী
ব'হে গেল জনতার ঢেউ—
কে যে তুমি কোথা আছ দেখে নাই কেউ॥
একা আমি দেখেছি তোমারে—
তুমিই ফেল নি ছায়া ছায়ার মাঝারে।
মালা হাতে গেনু ধেয়ে,
হাসিলে আমার পানে চেয়ে।
মোর স্বয়ম্বরে
সেদিন মর্তের মুখ ভ্রূকুটিল অবজ্ঞার ভরে॥

১০ ভাদ্র, ১৩৩৫

পথবর্তী

দূর মন্দিরে সিন্ধুকিনারে
পথে চলিয়াছ তুমি।
আমি তরু মোর ছায়া দিয়ে তারে
মৃত্তিকা তার চুমি।
হে তীর্থগামী, তব সাধনার
অংশ কিছু-বা রহিল আমার,
পথপাশে আমি তব যাত্রার
রহিব সাক্ষীরূপে।
তোমার পূজায় মোর কিছু যায়
ফুলের গন্ধধূপে॥

তব আহ্বানে বরণ করিয়া
নিয়েছি দুর্গমেরে।
ক্লান্তি কিছু-বা নিলাম হরিয়া
মোর অঞ্চল-ঘেরে।
যা ছিল কঠোর, যাহা নিষ্ঠুর,
তার সাথে কিছু মিলাই মধুর—
যা ছিল অজানা, যাহা ছিল দূর,
আমি তারি মাঝে থেকে
দিনু পথ'পরে শ্যাম অক্ষরে
জানার চিহ্ন এঁকে॥

মোর পরিচয়ে তোমার পথের
কিছু রহে পরিচয়,
তব রচনায় তব ভকতের
কিছু বাণী মিশে রয়।
তোমার মধ্যদিবসের তাপে
আমার স্নিগ্ধ কিশলয় কাঁপে,
মোর পল্লব সে মন্ত্র জাপে
গভীর যা তব মনে—
মোর ফলভার মিলানু তোমার
সাধনফলের সনে॥

বেলা চলে যাবে, একদা যখন
ফুরাবে যাত্রা তব,
শেষ হবে যবে মোর প্রয়োজন,
হেথাই দাঁড়ায়ে রব।
এই পথখানি রবে মোর প্রিয়,
এই হবে মোর চিরবরণীয়,
তোমারি স্মরণে রব স্মরণীয়—
না মানিব পরাভব।
তব উদ্দেশে অর্পিব হেসে
যা-কিছু আমার সব॥

১১ ভাদ্র, ১৩৩৫

মুক্তরূপ

তোমারে আপন কোণে স্তব্ধ করি যবে
　　পূর্ণ রূপে দেখি না তোমায়,
মোর রক্ততরঙ্গের মত্ত কলরবে
　　বাণী তব মিশে ভেসে যায়।
তোমার পাখারে আমি রুদ্ধ করি বুঝি,
সে বন্ধনে তোমারেই পাই না তো খুঁজি,
তুমি তো ছায়ার নহ, প্রভাতবিলাসী,
　　আলোতেই তোমার প্রকাশ—
তোমার ডানার ছন্দে তব উচ্চহাসি
　　যাক চলে ভেদিয়া আকাশ॥

জানি, যদি লুব্ধ মনে কৃপণতা করি
　　ঐশ্বর্যেও দৈন্য না ঘুচায়,
ব্যর্থ ভাণ্ডারের তবে রহিব প্রহরী—
　　বঞ্চনা করিব আপনায়।
আত্মা যেথা লুপ্ত থাকে সেথা উপচ্ছায়া
মুগ্ধ চেতনার 'পরে রচে তার মায়া,
তাই নিয়ে ভুলাব কি আমার জীবন—
　　গাঁথিব কি বুদ্‌বুদের হার।
তোমারে আড়াল ক'রে তোমার স্বপন
　　মিটাবে কি আকাঙ্ক্ষা আমার॥

বিরাজে মানবশৌর্যে সূর্যের মহিমা,
মর্তে সে তিমিরজয়ী প্রভু—
অজেয় আত্মার রশ্মি, তারে দিবে সীমা
প্রেমের সে ধর্ম নহে কভু।
যাও চলি রণক্ষেত্রে, লও শঙ্খ তুলি,
পশ্চাতে উড়ুক তব রথচক্রধূলি—
নির্দয় সংগ্রাম-অন্তে মৃত্যু যদি আসি
দেয় ভালে অমৃতের টিকা,
জানি যেন, সে তিলকে উঠিল প্রকাশি
আমারও জীবনজয়লিখা॥

আমার প্রাণের শক্তি প্রাণে তব লহো—
মোর দুঃখযজ্ঞের শিখায়
জ্বালিবে মশাল তব, আতঙ্কদুঃসহ
রাত্রিরে দহি সে যেন যায়।
তোমারে করিনু দান শ্রদ্ধার পাথেয়—
যাত্রা তব ধন্য হোক, যাহা-কিছু হেয়
ধূলিতলে হোক ধূলি, দ্বিধা যাক মরি,
চরিতার্থ হোক ব্যর্থতাও—
তোমার বিজয়মাল্য হতে ছিন্ন করি
আমারে একটি পুষ্প দাও॥

১৩ ভাদ্র, ১৩৩৫

স্পর্ধা

শ্লথপ্রাণ দুর্বলের স্পর্ধা আমি কভু সহিব না।
লোলুপ সে লালায়িত ; প্রেমেরে সে করে বিড়ম্বনা
ক্লেদঘন চাটুবাক্যে ; বাষ্পে বিজড়িত দৃষ্টি তার ;
কলুষকুণ্ঠিত অঙ্গে লিপ্ত করে গ্লানি লালসার ;
আবেশে মন্থর কণ্ঠে গদ্‌গদ সে প্রার্থনা জানায় ;
আলোকবঞ্চিত তার অন্তরের কানায় কানায়
দুষ্ট ফেন উঠে বুদ্‌বুদিয়া— ফেটে যায়, দেয় খুলি
রুদ্ধ বিষবায়ু। গলিত মাংসের যেন ক্রিমিগুলি
কল্পনাবিকার তার শিথিল চিন্তার তলে তলে
আকুলিতে থাকে কিলিবিলি।— যেন প্রাণপণ বলে
মন তারে করে কশাঘাত। জীর্ণমজ্জা কাপুরুষে
নারী যদি গ্রাহ্য করে, লজ্জিত দেবতা তারে দূষে
অসহ্য সে অপমানে। নারী সে-যে মহেন্দ্রের দান,
এসেছে ধরিত্রীতলে পুরুষেরে সঁপিতে সম্মান॥

১৪ ভাদ্র, ১৩৩৫
জোড়াসাঁকো

রাখীপূর্ণিমা

কাহারে পরাব রাখী যৌবনের রাখীপূর্ণিমায়,
হে মোর ভাগ্যের দেব। লগ্ন যেন ব'হে নাহি যায়।
মেঘে আজি আবিষ্ট অম্বর ; ঘন বৃষ্টি-আচ্ছাদনে
অস্পষ্ট আলোর মন্ত্র আকাশ নিবিষ্ট হয়ে শোনে,
বুঝিতে পারে না ভালো। আমি ভাবিতেছি একা বসে,
আমার বাঞ্ছিত কবে বাহিরিল প্রচ্ছন্ন প্রদোষে
চিহ্নহীন পথে। এসেছিল দ্বারের সম্মুখে মোর
ক্ষণতরে। তখনো রজনী মম হয় নাই ভোর,
হৃদয় অস্ফুট ছিল অর্ধ-জাগরণে। ডাকে নি সে
নাম ধরে, দুয়ারে করে নি করাঘাত, গেছে মিশে
সমুদ্রতরঙ্গরবে তাহার অশ্বের হ্রেষাধ্বনি।
হে বীর অপরিচিত, শেষ হল আমার রজনী—
জানা তো হল না কোন্ দুঃসাধ্যের সাধন লাগিয়া
অস্ত্র তব উঠিল ঝঞ্ঝনি। আমি রহিনু জাগিয়া॥

১৫ ভাদ্র, ১৩৩৫

আহ্বান

কোথা আছ! ডাকি আমি। শোনো, শোনো, আছে প্রয়োজন
একান্ত আমারে তব। আমি নহি তোমার বন্ধন;
পথের সম্বল মোর প্রাণে। দুর্গমে চলেছ তুমি
নীরস নিষ্ঠুর পথে— উপবাসহিংস্র সেই ভূমি
আতিথ্যবিহীন; উদ্ধত নিষেধদণ্ড রাত্রিদিন
উদ্যত করিয়া আছে ঊর্ধ্বপানে। আমি ক্লান্তিহীন
সেই সঙ্গ দিতে পারি, প্রাণবেগে বহন যে করে
শুশ্রূষার পূর্ণশক্তি আপনার নিঃশঙ্ক অন্তরে—
যথা রুক্ষ রিক্তবৃক্ষ শৈলবক্ষ ভেদি অহরহ
দুর্দাম নির্ঝরে ঢালে দুর্নিবার সেবার আগ্রহ,
শুকায় না রসবিন্দু প্রখর নির্দয় সূর্যতেজে,
নীরস প্রস্তরতলে দৃঢ়বলে রেখে দেয় সে-যে
অক্ষয় সম্পদরাশি। সহাস্য উজ্জ্বল গতি তার
দুর্যোগে অপরাজিত, অবিচল বীর্যের আধার॥

১৬ ভাদ্র, ১৩৩৫

বাপী

একদা বিজনে যুগল তরুর মূলে
তৃষ্ণার জল তুমি দিয়েছিলে তুলে।
    আর কোনোখানে ছায়া নাহি দেখি
    শুধালেম, কাছে বসিতে দিবে কি।
সেদিন তোমার ঘরে ফিরিবার বেলা
ব'হে গেল বুঝি, কাজে হয়ে গেল হেলা॥

অদূরে হোথায় ভাঙা দেউলের ধারে
পূর্বযুগের পূজাহীন দেবতারে
    প্রভাত-অরুণ প্রতিদিন খোঁজে,
    শূন্য বেদীর অর্থ না বোঝে,
দিন শেষ হলে সন্ধ্যাতারার আলো
যে পূজারি নাই তারে বলে 'দীপ জ্বালো'॥

একদিন বুঝি দূরে কোন্ রাজধানী
রচনা করেছে দীর্ঘ এ পথখানি।
    আজি তার নাম নাই ইতিহাসে,
    জীর্ণ হয়েছে বালুকার গ্রাসে,
প্রান্তরশেষে শীর্ণ বনের কোলে
জনপদবধূ জল নিয়ে যায় চলে॥

লুপ্তকালের শুষ্কসাগর-ধারে
বহু বিস্মৃতি যেথা রয় স্তূপাকারে,
অতি পুরাতন কাহিনী যেথায়
রুদ্ধকণ্ঠে শূন্যে তাকায়,
হারানো ভাষার নিশার স্বপ্নছায়ে
হেরিনু তোমায়, আসিনু ক্লান্ত পায়ে ॥

দুটি তরু তারা, মরুর প্রাণের কথা,
লুকানো কী রসে বাঁচে তার শ্যামলতা।
সেদিন তাহারি মর্মর-সনে
কী ব্যথা মিশানু, জানে দুইজনে ;
মাথার উপরে উড়ে গেল কোন্ পাখি
হতাশ পাখার হাহাকার-রেখা আঁকি ॥

তপ্ত বালুরে ভর্ৎসিয়া মুহু মুহু
তাপিত বাতাস চিৎকারি উঠে হুহু।
ধূলির ঘূর্ণি, যেন বেঁকে বেঁকে
শাপ-লাগা প্রেত নাচে থেকে থেকে ;
রূঢ় রুদ্র রিক্তের মাঝখানে
দুইটি প্রহর ভরেছিনু প্রাণে গানে ॥

দিন শেষ হল, চলে যেতে হল একা ;
বলিনু তোমারে, আরবার হবে দেখা।
শুনে হেসেছিলে হাসিখানি ম্লান',
তরুণ হৃদয়ে যেন তুমি জান—

অসীমের বুকে অনাদি বিষাদখানি
আছে সারাখন মুখে আবরণ টানি॥

তার পরে কত দিন চলে গেল মিছে
একটি দিনেরে দলিয়া পায়ের নীচে।
বহু পরে যবে ফিরিলাম প্রিয়ে,
এ পথে আসিতে দেখি চমকিয়ে
আছে সেই কূপ, আছে সে যুগল তরু—
তুমি নাই, আছে তৃষিত স্মৃতির মরু॥

এ কূপের তলে মোর যক্ষের ধন
একটি দিনের দুর্লভ সেই ক্ষণ
চিরকাল ভরি রহিল লুকানো।
ওগো অগোচরা, জান নাহি জান—
আর কোনো দিনে অন্য যুগের প্রিয়া
তারে আর-কারে দিবে কি উদ্ধারিয়া॥

১৬ ভাদ্র, ১৩৩৫

মহুয়া

বিরক্ত আমার মন কিংশুকের এত গর্ব দেখি।
নাহি ঘুচিবে কি
অশোকের অতিখ্যাতি, বকুলের মুখর সম্মান।
ক্লান্ত কি হবে না কবিগান
মালতীর মল্লিকার
অভ্যর্থনা রচি বারম্বার।
রে মহুয়া, নামখানি গ্রাম্য তোর, লঘু ধ্বনি তার,
উচ্চশিরে তবু রাজকুলবনিতার
গৌরব রাখিস ঊর্ধ্বে ধরে।
আমি তো দেখেছি তোরে,
বনস্পতিগোষ্ঠী-মাঝে অরণ্যসভায়
অকুণ্ঠিত মর্যাদায়
আছিস দাঁড়ায়ে;
শাখা যত আকাশে বাড়ায়ে
শাল তাল সপ্তপর্ণ অশ্বথের সাথে
প্রথম প্রভাতে
সূর্য-অভিনন্দনের তুলেছিস গম্ভীর বন্দন।
অপ্রসন্ন আকাশের ভ্রূভঙ্গে যখন
অরণ্য উদ্‌বিগ্ন করি তোলে,
সেই কালবৈশাখীর ক্রুদ্ধ কলরোলে
শাখাব্যূহে ঘিরে
আশ্বাস করিস দান শঙ্কিত বিহঙ্গ-অতিথিরে॥

অনাবৃষ্টিক্লিষ্ট দিনে
বিশীর্ণ বিপিনে
বন্য বুভুক্ষুর দল ফেরে রিক্ত পথে,
দুর্ভিক্ষের ভিক্ষাঞ্জলি ভরে তারা তোর সদাব্রতে ॥

বহু দীর্ঘ সাধনায় সুদৃঢ় উন্নত,
তপস্বীর মতো
বিলাসের চাঞ্চল্য-বিহীন,
সুগম্ভীর সেই তোরে দেখিয়াছি অন্যদিন
অন্তরে অধীরা
ফাল্গুনের ফুলদোলে কোথা হতে জোগাস মদিরা
পুষ্পপুটে ;
বনে বনে মৌমাছিরা চঞ্চলিয়া উঠে।
তোর সুরাপাত্র হতে বন্যনারী
সম্বল সংগ্রহ করে পূর্ণিমার নৃত্যমত্ততারই।
রে অটল, রে কঠিন,
কেমনে গোপনে রাত্রিদিন
তরল যৌবনবহ্নি মজ্জায় রাখিয়াছিলি ভরে।
কানে কানে কহি তোরে—
বধূরে যেদিন পাব ডাকিব 'মহুয়া' নাম ধরে ॥

১৮ ভাদ্র, ১৩৩৫
[জোড়াসাঁকো]

দীনা

তোমারে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথ্যা কখনো কহি নি ;
প্রিয়তম, আমি বিরহিণী
পরিপূর্ণ মিলনের মাঝে।
মোর স্পর্শে বাজে
যে তন্ত্রটি তোমার বীণায়
তাহারি পঞ্চম স্বরে তোমারে কি নিঃশেষে চিনায়
তোমার বসন্তরাগে,
নিদ্রাহীন রজনীর পরজে বেহাগে।
সে তন্ত্র সোনার বটে, বিভাসে ললিতে
যে কথা সে চেয়েছে বলিতে
তাইতে হয়েছে পূর্ণ এ আমার জীবন-অঞ্জলি ॥

তবু সত্য করে বলি,
ব্যথা লাগে বুকে
যখন সহসা আসি তোমার সম্মুখে
নিভৃত তোমার ঘরে
স্বপ্নভাঙা প্রথম প্রহরে—
যখন জাগে নি পাখি, রক্তিম আকাশে
আসন্ন অরণ্যগাথা নব সূর্যোদয়-আশে
রয়েছে স্তম্ভিত,
পিঙ্গল আভায় দীপ্ত জটা- বিলম্বিত
অরুণ সন্ন্যাসী
করজোড়ে আছে স্থির আলোকপ্রত্যাশী—

তখন তোমার মুখ চেয়ে দেখিয়াছি ভয়ে ভয়ে,
জেনেছি হৃদয়ে
তুমিই অচেনা।
কোনোদিন ফুরাবে না
পরিচয় ; তোমারে বুঝিব আমি করি না সে আশা ;
কথায় যা বল নাই আমি যে জানি না তার ভাষা।
ভয় হয় পাছে
যে সম্পদ চেয়েছিলে মোর কাছে
সে-যে মোর নাই, তাই শেষে পড়ে ধরা—
দেখ দূর হতে এসে, জলাশয়ে জল নাই ভরা॥

তখন নিয়ো না যেন অপরাধ মোর,
হোয়ো না কঠোর।
তুমি যদি মুগ্ধ মনে ভুলে থাক তবু
গভীর দীনতা মোর গোপন করি নি আমি কভু।
মোর দ্বারে যবে এলে অন্যমনা
সে কি মোর কিছু নিয়ে পুরাতে কামনা।
নহে নহে, হে রাজন্, তোমার অনেক ধন আছে,
তাই তুমি আস মোর কাছে
দেবার আনন্দ তব পূর্ণ করিবার লাগি ;
যদি তাই পূর্ণ হয় তবে আমি নহি তো অভাগী॥

১৯ ভাদ্র, ১৩৩৫

সৃষ্টিরহস্য

সৃষ্টির রহস্য আমি তোমাতে করেছি অনুভব,
নিখিলের অস্তিত্বগৌরব।
তুমি আছ, তুমি এলে,
এ বিস্ময় মোর পানে আপনারে নিত্য আছে মেলে
অলৌকিক পদ্মের মতন।
অন্তহীন কাল আর অসীম গগন,
নিদ্রাহীন আলো,
কী অনাদি মন্ত্রে তারা অঙ্গ ধরি তোমাতে মিলালো।
যুগে যুগে কী অক্লান্ত সাধনায়
অগ্নিময়ী বেদনায়
নিমেষে হয়েছে ধন্য শক্তির মহিমা
পেয়ে আপনার সীমা
ওই মুখে, ওই চক্ষে, ওই হাসিটিতে।
সেই সৃষ্টিতপস্যার সার্থক আনন্দ মোর চিতে
স্পর্শ করে, যবে তব মুখে মেলি আঁখি
সম্মুখে তোমার বসে থাকি॥

৪ ভাদ্র, ১৩৩৫

নান্নী

শামলী

সে যেন গ্রামের নদী
বহে নিরবধি
মৃদুমন্দ কলকলে ;
তরঙ্গের ভঙ্গী নাই, আবর্তের ঘূর্ণি নাই জলে ;
নুয়ে-পড়া তটতরু ঘনচ্ছায়া-ঘেরে
ছোটো ক'রে রাখে আকাশেরে।
জগৎ সামান্য তার, তারি ধূলি-'পরে
বনফুল ফোটে অগোচরে,
মধু তার নিজ মূল্য নাহি জানে,
মধুকর তারে না বাখানে।
গৃহকোণে ছোটো দীপ জ্বালায় নেবায়,
দিন কাটে সহজ সেবায়।
স্নান সাঙ্গ করি এলোচুলে
অপরাজিতার ফুলে
প্রভাতে নীরব নিবেদনে
স্তব করে একমনে।
মধ্যদিনে বাতায়নতলে
চেয়ে দেখে নিম্নে দিঘিজলে
শৈবালের ঘন স্তর,
পতঙ্গের খেলা তারি 'পর।

আবছায়া কল্পনায়
ভাষাহীন ভাবনায়
মন তার ভরে
মধ্যাহ্নের অব্যক্ত মর্মরে
সায়াহ্নের শান্তিখানি নিয়ে ঘোমটায়
নদীপথে যায়
ঘট-কাঁখে
বেণুবীথিকার বাঁকে বাঁকে
ধীর পায়ে চলি—
নাম কি শামলী ॥

প্রচ্ছন্নদাক্ষিণ্যভারে চিত্ত তার নত
স্তম্ভিত মেঘের মতো,
তৃষ্ণাহরা
আষাঢ়ের আত্মদান-প্রত্যাশায় ভরা।
সে যেন গো তমালের ছায়াখানি,
অবগুণ্ঠনের তলে পথ-চাওয়া আতিথ্যের বাণী।
যে পথিক একদিন আসিবে দুয়ারে
ক্লিষ্ট ক্লান্তিভারে
সেই অজানার লাগি গৃহকোণে আনতনয়ন
বুনিছে শয়ন।
সে যেন গো কাকচক্ষু স্বচ্ছ দিঘিজল
অচঞ্চল
কানায়-কানায়-ভরা,
শীতল অতল-মাঝে প্রসন্ন কিরণ দেয় ধরা।
কালো চক্ষুপল্লবের কাছে
থমকিয়া আছে
স্তব্ধ ছায়া পাতি
হাসির খেলার সাথি
সুগম্ভীর স্নিগ্ধ অশ্রুবারি;
যেন তাহা দেবতারই
করুণা-অঞ্জলি—
নাম কি কাজলী॥

হেঁয়ালি

যারে সে বেসেছে ভালো তারে সে কাঁদায়।
নূতন ধাঁধায়
ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া দেয় তারে,
কেবলি আলো-আঁধারে
সংশয় বাধায় ;
ছল-করা অভিমানে বৃথা সে সাধায়।
সে কি শরতের মায়া
উড়ো মেঘে নিয়ে আসে বৃষ্টিভরা ছায়া।
অনুকূল চাহনির তলে
কী বিদ্যুৎ ঝলে।
কেন দয়িতের মিনতিকে
অভাবিত উচ্চহাস্যে উড়াইয়া দেয় দিকে দিকে।
তার পরে আপনার নির্দয় লীলায়
আপনি সে ব্যথা পায়,
ফিরে যে গিয়েছে তারে ফিরায়ে ডাকিতে কাঁদে প্রাণ ;
আপনার অভিমানে করে খান্‌খান্‌॥

কেন তার চিত্তাকাশে সারা বেলা
পাগল হাওয়ার এই এলোমেলো খেলা।
আপনি সে পারে না বুঝিতে
যে দিকে চলিতে চায় কেন তার চলে বিপরীতে।
গভীর অন্তরে
যেন আপনার অগোচরে

আপনার সাথে তার কী আছে বিরোধ,
অন্যেরে আঘাত করে আত্মঘাতী ক্রোধ ;
মুহূর্তেই বিগলিত করুণায়
অপমানিতের পায়
প্রাণমন দেয় ঢালি—
নাম কি হেঁয়ালি ॥

খেয়ালী

মধ্যাহ্নে বিজন বাতায়নে
সুদূর গগনে
কী দেখে সে ধানের খেতের পরপারে—
নিরালা নদীর পথে দিগন্তে সবুজ অন্ধকারে
যেখানে কাঁঠাল জাম নারিকেল বেত
প্রসারিয়া চলেছে সংকেত
অজানা গ্রামের,
সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু অখ্যাত নামের।
অপরাহ্ণে ছাদে বসি
এলোচুল বুকে পড়ে খসি,
গ্রন্থ নিয়ে হাতে
উদাস হয়েছে মন সে যে কোন্ কবিকল্পনাতে।
সুদূরের বেদনায়
অতীতের অশ্রুবাষ্প হৃদয়ে ঘনায়।
বীরের কাহিনী
না-দেখা জনের লাগি তারে যেন করে বিরহিণী॥

পূর্ণিমানিশীথে
স্রোতে-ভাসা একা তরী যবে সকরুণ সারিগীতে
ছায়াঘন তীরে তীরে সুপ্তিতে সুরের ছবি আঁকে
উৎসুক আকাঙ্ক্ষা জেগে থাকে
নিষুপ্ত প্রহরে,
অহৈতুক বারিবিন্দু ঝরে

আঁখিকোণে ;
যুগান্তরপার হতে কোন্ পুরাণের কথা শোনে।
ইচ্ছা করে সেই রাতে
লিপিখানি লেখে ভূর্জপাতে
লেখনীতে ভরি লয়ে দুঃখে-গলা কাজলের কালী—
নাম কি খেয়ালী ॥

কাকলী

কলছন্দে পূর্ণ তার প্রাণ—
নিত্যবহমান
ভাষার কল্লোলে
জাগাইয়া তোলে
চারি ধারে
প্রত্যহের জড়তারে ;
সংগীতে তরঙ্গ তুলি
হাসিতে ফেনিল তার ছোটে দিনগুলি।
আঁখি তার কথা কয়, বাহুভঙ্গী কত কথা বলে,
চরণ যখন চলে
কথা কয়ে যায়—
যে কথাটি অরণ্যের পাতায় পাতায় ;
যে কথাটি ঢেউ তোলে
আশ্বিনে ধানের খেতে, প্রান্ত হতে প্রান্তে যায় চলে ;
যে কথাটি নিশীথতিমিরে
তারায় তারায় কাঁপে অধীর মির্মিরে ;
যে কথাটি মহুয়ার বনে
মধুপগুঞ্জনে
সারাবেলা উঠিছে চঞ্চলি—
নাম কি কাকলী॥

পিয়ালী

চাহনি তাহার, সব কোলাহল হলে সারা
সন্ধ্যার তিমিরে ভাসা তারা।
মৌনখানি সুমধুর মিনতিরে
লতায়ে লতায়ে যেন মনের চৌদিকে দেয় ঘিরে;
নির্বাক্ চাহিয়া থাকে, নাহি পায় ভেবে
কেমন করিয়া কী-যে দেবে।
দুয়ারবাহিরে
আসে ধীরে,
ক্ষণেক নীরব থেকে চলে যায় ফিরে।
না'ও যদি কয় কথা
মনে যেন ভরি দেয় সুস্নিগ্ধ মমতা।
পায়ের চলায়
কিছু যেন দান করে ধূলির তলায়।
তারে কিছু করিলে জিজ্ঞাসা
কিছু বলে, কিছু তবু বাকি থাকে ভাষা।
নিঃশব্দে খুলিয়া দ্বার
অঞ্চলে আড়াল করি সে যেন কাহার
আনিয়াছে সৌভাগ্যের থালি—
নাম কি পিয়ালী॥

দিয়ালী

জনতার মাঝে
দেখিতে পাই নে তারে, থাকে তুচ্ছ সাজে।
ললাটে ঘোমটা টানি
দিবসে লুকায়ে রাখে নয়নের বাণী।
রজনীর অন্ধকার
তুলে দেয় আবরণ তার।
রাজরানীবেশে
অনায়াসগৌরবের সিংহাসনে বসে মৃদু হেসে
বক্ষে হার ঝলমলে,
সীমন্তে অলকে জ্বলে
মাণিক্যের সিঁথি।
কী যেন বিস্মৃতি
সহসা ঘুচিয়া যায়, টুটে দীনতার ছদ্মসীমা,
মনে পড়ে আপন মহিমা।
ভক্তেরে সে দেয় পুরস্কার
বরমাল্য তার
আপন সহস্র দীপ জ্বালি—
নাম কি দিয়ালী॥

নাগরী

ব্যঙ্গসুনিপুণা,
শ্লেষবাণসন্ধানদারুণা।
অনুগ্রহবর্ষণের মাঝে
বিদ্রূপবিদ্যুৎঘাত অকস্মাৎ মর্মে এসে বাজে।
সে যেন তুফান
যাহারে চঞ্চল করে সে তরীকে করে খান্‌খান্‌
অট্টহাস্য আঘাতিয়া এপাশে ওপাশে ;
প্রশ্রয়ের বীথিকায় ঘাসে ঘাসে
রেখেছে সে কণ্টক-অঙ্কুর বুনে বুনে ;
অদৃশ্য আগুনে
কুঞ্জ তার বেড়িয়াছে ;
যারা আসে কাছে
সব থেকে তারা দূরে রয় ;
মোহমন্ত্রে যে হৃদয়
করে জয়
তারি 'পরে অবজ্ঞায় দারুণ নির্দয়।

আপন তপস্যা লয়ে যে পুরুষ নিশ্চল সদাই,
যে উহারে ফিরে চাহে নাই,
জানি সেই উদাসীন
একদিন
জিনিয়াছে ওরে ;
জ্বালাময়ী তারি পায়ে দীপ্ত দীপ দিল অর্ঘ্য ভ'রে॥

বিদুষী নিয়েছে বিদ্যা শুধু চিত্তে নয়,
আপন রূপের সাথে ছন্দ তারে দিল অঙ্গময় ;
বুদ্ধি তার ললাটিকা,
চক্ষুর তারায় বুদ্ধি জ্বলে দীপশিখা ;
বিদ্যা দিয়ে রচে নাই পণ্ডিতের স্থূল অহংকার,
বিদ্যারে করেছে অলংকার।
প্রসাধনসাধনে চতুরা—
জানে সে ঢালিতে সুরা
ভূষণভঙ্গীতে,
অলক্তের আরক্ত ইঙ্গিতে।
জাদুকরী বচনে চলনে ;
গোপন সে নাহি করে আপন ছলনে ;
অকপট মিথ্যারে সে নানা রসে করিয়া মধুর
নিন্দা তার করি দেয় দূর ;
জ্যোৎস্নার মতন
গোপনেও নহে সে গোপন।
আঁধার-আলোরই কোলে রয়েছে জাগরি'—
নাম কি নাগরী॥

সাগরী

বাহিরে সে দুরন্ত আবেগে
উচ্ছলিয়া উঠে জেগে—
উচ্চহাস্যতরঙ্গ সে হানে
সূর্যচন্দ্র-পানে।
পাঠায় অস্থির চোখ—
আলোকের উত্তরে আলোক।
কভু অন্ধকারপুঞ্জে দেখা দেয় ঝঞ্ঝার ভ্রূকুটি,
ক্ষণে ক্ষণে
আন্দোলনে
প্রচণ্ড অধৈর্যবেগে তটের মর্যাদা ফেলে টুটি।
গভীর অন্তর তার নিস্তব্ধ গম্ভীর,
কোথা তল, কোথা তীর;
অগাধ তপস্যা যেন রেখেছে সঞ্চিত করি—
নাম কি সাগরী॥

যেন তার চক্ষুমাঝে
উদ্যত বিরাজে
মহেশের তপোবনে নন্দীর ত[illegible]
ইন্দ্রের অশনি
মৌনে তার ঢাকা ;
প্রাণ তার অরুণের পাখা
মেলিল দিনের বক্ষে তীব্র অতৃপ্তিতে
দুঃসহ দীপ্তিতে।
সাধক দাঁড়ায় তার কাছে,
সহসা সংশয় লাগে যোগ্যতা কি আছে ;
দুঃসাধ্য সাধনতরে
পথ খুঁজে মরে।
তুচ্ছতারে দাহে তার অবজ্ঞাদহন ;
এনেছে সে করিয়া বহন
ইন্দ্রাণীর গাঁথা মাল্য ; দিবে কণ্ঠে তার
কার্মুকে যে দিয়েছে টংকার,
কাপট্যেরে হানিয়াছে, সত্যে যার ঋণী বসুমতী—
নাম কি জয়ন্তী॥

ঝামরী

সে যেন খসিয়া-পড়া তারা,
মর্তের প্রদীপে নিল মৃত্তিকার কারা।
নগরে জনতামরু,
সে যেন তাহারি মাঝে পথপ্রান্তে সঙ্গীহীন তরু,
তারে ঢেকে আছে নিতি
অরণ্যের সুগভীর স্মৃতি।
সে যেন অকালে-ফোটা কুবলয়,
শিশিরে কুণ্ঠিত হয়ে রয়।
মন পাখা মেলিবারে চায়,
চারি দিকে ঠেকে যায়,
জানে না কিসের বাধা তার ;
অদৃষ্টের মায়াদুর্গদ্বার
কোন্ রাজপুত্র এসে
মন্ত্রবলে ভেঙে দেবে শেষে।
আকাশে আলোতে
নিমন্ত্রণ আসে যেন কোথা হতে,
পথ রুদ্ধ চারি ধারে—
মুখ ফুটে বলিতে না পারে
অলক্ষ্য কী আচ্ছাদনে কেন সে আবৃতা॥

সে যেন অশোকবনে সীতা,
চারি দিকে যারা আছে কেহ তার নহেক স্বকীয় ;
কে তারে পাঠাবে অঙ্গুরীয়

বিচ্ছেদের অতল সমুদ্র-পারে।
আঁখি তুলে তাই বারে বারে
চেয়ে দেখে নিরুত্তর নিঃশব্দ গগনে॥

কোন্ দেব নিত্যনির্বাসনে
পাঠালো তাহারে!
স্বর্গের বীণার তারে
সংগীতে কি করেছিল ভুল।
মহেন্দ্রের-দেওয়া ফুল
নৃত্যকালে খসে গেলে অন্যমনে দলেছিল কভু?
আজও তবু
মন্দারের গন্ধ যেন আছে তার বিষাদে জড়ানো,
অধরে রয়েছে তার ম্লান—
সন্ধ্যার গোলাপ-সম—
মাঝখানে-ভেঙে-যাওয়া অমরার গীতি অনুপম।
অদৃশ্য যে অশ্রুধারা
আবিষ্ট করেছে তার চক্ষুতারা
তাহা দিব্য বেদনার করুণানির্ঝরী—
নাম কি ঝামরী॥

মুরতি

যে শক্তির নিত্যলীলা নানা বর্ণে আঁকা,
যে গুণী প্রজাপতির পাখা
যুগ যুগ ধ্যান করি একদা কী খনে
রচিল অপূর্ব চিত্রে বিচিত্র লিখনে—
এই নারী
রচনা তাহারি।
এ শুধু কালের খেলা,
এর দেহ কী আলস্যে বিধাতা একেলা
রচিলেন সন্ধ্যাকালে
আপনার অর্থহীন ক্ষণিক খেয়ালে—
যে লগনে
কর্মহীন ক্লান্তক্ষণে
মেঘের মহিমামায়া মুহূর্তেই মুগ্ধ করি আঁখি
অন্ধরাত্রে বিনা ক্ষোভে যায় মুখ ঢাকি।
শরতে নদীর জলে যে ভঙ্গিমা,
বৈশাখে দাড়িম্ববনে যে রাগরঙ্গিমা
যৌবনের দাপে
অবজ্ঞাকটাক্ষ হানে মধ্যাহ্নের তাপে,
শ্রাবণের বন্যাতলে হারা
ভেসে-যাওয়া শৈবালের যে নৃত্যের ধারা,
মাঘশেষে অশ্বত্থের কচি পাতাগুলি
যে চাঞ্চল্যে উঠে দুলি,
হেমন্তের প্রভাতবাতাসে

শিশিরে যে ঝিলিমিলি ঘাসে ঘাসে,
প্রথম আষাঢ়দিনে গুরুগুরু রবে
ময়ূরের পুচ্ছপুঞ্জ উল্লসিয়া উঠে যে গৌরবে,
তাই দিয়ে রচিত সুন্দরী—
লতা যেন নারী হয়ে দিল চক্ষু ভরি ॥

রঙিন বুদ্‌বুদ সে কি, ইন্দ্রধনু বুঝি,
অন্তর না পাই খুঁজি—
সকলই বাহির,
চিত্ত অগভীর।
কারো পথ চেয়ে নাহি থাকে,
কারে না পাওয়ার দুঃখ মনে নাহি রাখে।
মুগ্ধ প্রাণ-উপহার
অনায়াসে নেয়, আর অনায়াসে ভোলে দায় তার।
সরস্বতী রচিলেন মন তার কোন্ অবসরে
রাগহীন বাণীহীন গুঞ্জনের স্বরে ;
অমৃতে-মাটিতে-মেশা সৃজনের এ কোন্ সুরতি—
নাম কি মুরতি ॥

হাসিমুখ নিয়ে যায় ঘরে ঘরে,
সখীদের অবকাশ মধু দিয়ে ভরে।
প্রসন্নতা তার অন্তহীন
রাত্রিদিন
গভীর কী উৎস হতে
উচ্ছলিছে আলো-ঝলা কথা-বলা স্রোতে।
মর্তের ম্লানতা তারে
পারে নি তো স্পর্শ করিবারে।
প্রভাতে সে দেখা দিলে মনে হয় যেন সূর্যমুখী
রক্তারুণ উল্লাসে কৌতুকী।
মধ্যাহ্নের স্থলপদ্ম অমলিন রাগে
প্রফুল্ল সে সূর্যের সোহাগে;
সায়াহ্নের জুঁই সে-যে—
গন্ধে যার প্রদোষের শূন্যতায় বাঁশি ওঠে বেজে।
মৈত্রীসুধাময় চোখে
মাধুরী মিশায়ে দেয় সন্ধ্যাদীপালোকে।
রজনীগন্ধা সে রাতে, দেয় পরকাশি
আনন্দহিল্লোল রাশি রাশি;
সঙ্গহীন আঁধারের নৈরাশ্যক্ষালিনী—
নাম কি মালিনী॥

তরুলতা
যে ভাষায় কয় কথা
সে ভাষা সে জানে—
তৃণ তার পদক্ষেপ দয়া বলি মানে।
পুষ্পপল্লবের 'পরে তার আঁখি
অদৃশ্য প্রাণের হর্ষ দিয়ে যায় রাখি।
স্নেহ তার আকাশের আলোর মতন
কাননের অন্তরবেদন
দূর্ করিবার লাগি
নিত্য আছে জাগি।
শিশু হতে শিশুতর
গাছগুলি বোবা প্রাণে ভর-ভর,
বাতাসে বৃষ্টিতে
চঞ্চলিয়া জাগে তারা অর্থহীন গীতে,
ধরণীর যে গভীরে চিররসধারা
সেইখানে তারা
কাঙাল প্রসারি ধরে তৃষিত অঞ্জলি,
বিশ্বের করুণারাশি শাখায় শাখায় উঠে ফলি—
সে তরুলতারই মতো স্নিগ্ধ প্রাণ তার ;
শ্যামল উদার
সেবা যত্ন সরল শান্তিতে
ঘনচ্ছায়া বিস্তারিয়া আছে চারি ভিতে ;
তাহার মমতা

সকল প্রাণীর 'পরে বিছায়েছে স্নেহের সমতা ;
পশু পাখি তার আপনার ;
জীববৎসলার
স্নেহ ঝরে শিশু-'পরে, বনে যেন নত মেঘভার
ঢালে বারিধার ।
তরুণ প্রাণের 'পরে করুণায় নিত্য সে তরুণী—
নাম কি করুণী ॥

প্রতিমা

চতুর্দশী এল নেমে,
পূর্ণিমার প্রান্তে এসে গেল থেমে।
অপূর্ণের ঈষৎ আভাসে
আপন বলিতে তারে মর্তভূমি শঙ্কা নাহি বাসে।
এ ধরার নির্বাসনে
কুণ্ঠার গুণ্ঠন নাই, ভীরুতা নাইকো তার মনে ;
সংসারজনতামাঝে
আপনাতে আপনি বিরাজে।
দুঃখে শোকে অবিচল, ধৈর্য তার প্রফুল্লতা-ভরা
সকল উদ্‌বেগভারহরা।
রোগ যদি আসে রুখে
সকরুণ শান্ত হাসি লেগে থাকে গ্লানিহীন মুখে।
দুর্যোগ মেঘের মতো
নীচে দিয়ে ব'হে যায় কত
বারে বারে,
প্রভা তার মুছিতে না পারে॥

তবু তার মহিমায় কিছু আছে বাকি,
সেইখানে রাখে ঢাকি
অশ্রুজল
বিষাদ-ইঙ্গিতে-ছোঁওয়া ঈষৎ বিহ্বল।

কণামাত্র সে ক্ষীণতা
নাহি কহে কথা,
কেহ না দেখিতে পায়
নিত্য যারা ঘিরে আছে তায়
অমরার অসীমতা মাটিতে নিয়েছে সীমা—
নাম কি প্রতিমা ॥

নন্দিনী

প্রথম সৃষ্টির ছন্দখানি
অঙ্গে তার নক্ষত্রের নৃত্য দিল আনি।
বর্ষা-অন্তে ইন্দ্রধনু
মর্তে নিল তনু।
দিগ্‌বধূর মায়াবী অঙ্গুলি
চঞ্চল চিন্তায় তার বুলায়েছে বর্ণ-আঁকা তুলি।
সরল তাহার হাসি, সুকুমার মুঠি
যেন শুভ্র কমলকলিকা,
আঁখি দুটি
যেন কালো আলোকের সচকিত শিখা।
অবসাদবন্ধভাঙা মুক্তির সে ছবি,
সে আনিয়া দেয় চিত্তে
কলনৃত্যে
দুস্তর-প্রস্তর-ঠেলা ফেনোচ্ছল আনন্দজাহ্নবী।
বীণার তন্ত্রের মতো গতি তার সংগীতস্পন্দিনী-
নাম কি নন্দিনী॥

উষসী

ভোরের আগের যে প্রহরে
স্তব্ধ অন্ধকার-'পরে
সুপ্তি-অন্তরাল হতে দূর সূর্যোদয়
বনময়
পাঠায় নূতন জাগরণী,
অতি মৃদু শিহরনি
বাতাসের গায়ে,
পাখির কুলায়ে
অস্পষ্ট কাকলি ওঠে আধো-জাগা স্বরে,
স্তম্ভিত আগ্রহভরে
অব্যক্ত বিরাট আশা ধ্যানে মগ্ন দিকে দিগন্তরে-
ও কোন্ তরুণ প্রাণে করিয়াছে ভর
অন্তর্গূঢ় সে প্রহর
আত্ম-অগোচর।
চিত্ত তার আপনার গভীর অন্তরে
নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে
পরিপূর্ণ সার্থকতা লাগি।
সুপ্তিমাঝে প্রতীক্ষিয়া আছে জাগি
নির্মল নির্ভয়
কোন্ দিব্য অভ্যুদয়।

কোন্ সে পরমা মুক্তি, কোন্ সেই আপনার
দীপ্যমান মহা-আবিষ্কার।
প্রভাতমহিমা ওর সম্বৃত রয়েছে নিশ্চেতনে,
তাহারি আভাস পাই মনে।
আমি ওই রথশব্দ শুনি,
সোনার বীণার তারে সংগীত আনিছে কোন্ গুণী।
জাগিবে হৃদয়,
ভুবন তাহার হবে বাণীময়;
মানসকমল একমনা
নবোদিত তপনের করিবে প্রথম অভ্যর্থনা।
জাগিবে নূতন দিবা উজ্জ্বল উল্লাসে
বর্ণে গন্ধে গানে প্রাণে মহোৎসবে তার চারি পাশে।
নিরুদ্ধ চেতনা হতে হবে চ্যুত
লালসা-আবেশে-জড়ীভূত
স্বপ্নের শৃঙ্খলপাশ।
বিলুপ্ত করিবে দূরে উন্মুক্ত বাতাস
দুর্বল দীপের গাঢ় বিষতপ্ত কলুষনিশ্বাস।
আলোকের জয়ধ্বনি উঠিবে উচ্ছ্বসি—
নাম কি উষসী॥

নাম্নী-রচনা
? শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৩৫

ছায়ালোক

যেথায় তুমি গুণী জ্ঞানী, যেথায় তুমি মানী,
যেথায় তুমি তত্ত্ববিদের সেরা,
আমি সেথায় লুকিয়ে যেতে পথ পাব না জানি—
সেথায় তুমি লোকের ভিড়ে ঘেরা।
সেথায় তোমার বুদ্ধি সদাই জাগে,
চক্ষে তোমার আবেশ নাহি লাগে,
আমার ভীরু হৃদয় ছায়া মাগে—
তোমার সেথায় আলোক খরতর,
যখন সেথা চাহ আমার বাগে
সংকোচে প্রাণ কাঁপে থরথর॥

মোহভাঙা দৃষ্টি তোমার যখন আঘাত হানে
যায় নিখিলের রহস্যদ্বার টুটে,
এক নিমেষে অপরূপের রূপের মধ্যখানে
অস্ত্র যন্ত্র প্রকাশ পেয়ে উঠে।
বসুন্ধরার শ্যামল প্রাণের ঢাকা
রূঢ় পাথর গোপন ক'রে রাখা,
ভিতরে তার কতই আঁকাবাঁকা
কতকালের দাহন-ইতিহাসে—
ফাটল-ধরা কত-যে দাগ আঁকা
তোমার চোখে বাহির হয়ে আসে॥

তেমনি ক'রে যখন কভু আমার পানে চাবে
মর্মভেদী কৌতূহলের আঁখি,
বিধাতা যা লুকান লাজে দেখতে-যে তাই পাবে
মোর রচনায় যা আছে তাঁর বাকি।
আমার মাঝে তোমার অগোচরে
আদিম যুগের গোপন গভীর স্তরে
অপূর্ণতা রয়েছে অন্তরে,
সৃষ্টি আমার অসমাপ্ত আছে—
সামনে এলে মরি-যে সেই ডরে
ভাঙাচোরা চক্ষে পড়ে পাছে॥

তোমার প্রাণে কোনোখানে নাই কি মায়ার ঠাঁই
মত্ততাহীন তত্ত্বপরপারে,
যেথায় তীক্ষ্ণ চোখের কোনো প্রশ্ন জেগে নাই
অসতর্ক মুক্ত হৃদয়দ্বারে?
যেথায় তুমি দৃষ্টিকর্তা নহ,
সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি লয়ে রহ,
যেথা নানা বর্ণের সংগ্রহ,
যেথা নানা মূর্তিতে মন মাতে,
যেথা তোমার অতৃপ্ত আগ্রহ
আপন-ভোলা রসের রচনাতে॥

সেথায় আমি যাব যখন চৈত্ররজনীতে
বনের বাণী হাওয়ায় নিরুদ্দেশা,
চাঁদের আলোয় ঘুম-হারানো পাখির কলগীতে
পথ-হারানো ফুলের রেণু মেশা।

দেখবে আমায় স্বপন-দেখা চোখে—
চমকে উঠে বলবে তুমি, 'ও কে,
কোন্ দেবতার ছিল মানসলোকে—
এল আমার গানের ডাকে ডাকা।'
সে রূপ আমার দেখবে ছায়ালোকে
যে রূপ তোমার পরান দিয়ে আঁকা॥

৯ আশ্বিন, ১৩৩৫

প্রচ্ছন্না

বিদেশে ঐ সৌধশিখর'পরে
ক্ষণকালের তরে
পথ হতে যে দেখেছিলেম, ওগো আধেক-দেখা,
মনে হল, তুমি অসীম একা।
দাঁড়িয়ে ছিলে যেন আমার একটি বিজন ক্ষণে,
আর কিছু নাই সেথায় ত্রিভুবনে।
সামনে তোমার মুক্ত আকাশ, অরণ্যতল নীচে,
ক্ষণে ক্ষণে ঝাউয়ের শাখা প্রলাপ মর্মরিছে।
মুখ দেখা না যায়,
পিঠের 'পরে বেণীটি লুটায়।
থামের পাশে হেলান-দেওয়া ঈষৎ দেখি আধখানি ঐ দেহ,
অসম্পূর্ণ কয়টি রেখায় কী যেন সন্দেহ।
বন্দিনী কি ভোগের কারাগারে,
ভাবনা তোমার উড়ে চলে দূর দিগন্তপারে?
সোনার বরণ শস্যখেতে, কোন্ সে নদীতীরে
পূজারিদের চলার পথে, উচ্চচূড়া দেবতামন্দিরে
তোমার চিরপরিচিত প্রভাত-আলোখানি,
তারি স্মৃতি চক্ষে তোমার জল কি দিল আনি॥

কিম্বা তুমি রাজেন্দ্রসোহাগী,
সেই বহুবল্লভের প্রেমে দ্বিধার দুঃখ হৃদয়ে রয় জাগি,
প্রশ্ন কি তাই শুধাও নক্ষত্রেরে
সপ্তঋষির কাছে তোমার প্রণামখানি সেরে।
হয়তো বৃথাই সাজ',
তৃপ্তিবিহীন চিত্ততলে তৃষ্ণা-অনল দহন করে আজও ;
তাই কি শূন্য আকাশ -পানে চাও,
উপেক্ষিত যৌবনেরই ধিক্কার জানাও ?

কিম্বা আছ চেয়ে
আসবে সে কোন্ দুঃসাহসী গোপন পন্থা বেয়ে—
বক্ষ তোমার দোলে,
রক্ত নাচে ত্রাসের উতরোলে।
স্তব্ধ আছে তরুশ্রেণী মরণছায়া-ঢাকা,
শূন্যে ওড়ে অদৃশ্য কোন্ পাখা।
আমি পথিক যাব যে কোন্ দূরে ;
তুমি রাজার পুরে
মাঝে মাঝে কাজের অবসরে
বাহির হয়ে আসবে হোথায় ঐ অলিন্দ-'পরে,
দেখবে চেয়ে অকারণে স্তব্ধ নেত্রপাতে
গোধূলি-বেলাতে
বনের সবুজ তরঙ্গ পারায়ে
নদীর প্রান্তরেখায় যে পথ গিয়েছে হারায়ে।
তোমার ইচ্ছা চলবে কল্পনাতে
সুদূর পথে আভাসরূপী সেই অজানার সাথে

পান্থ যে জন নিত্য চলে যায়।
আমি পথিক হায়
পিছন-পানে এই বিদেশের সুদূর সৌধশিরে
ইচ্ছা আমার পাঠাই ফিরে ফিরে
ছায়ায়-ঢাকা আধেক-দেখা তোমার বাতায়নে,
যে মুখ তোমার লুকিয়ে ছিল সে মুখ আঁকি মনে ॥

১০ আশ্বিন, ১৩৩৫

দর্পণ

দর্পণ লইয়া তারে কী প্রশ্ন শুধাও একমনে
হে সুন্দরী, কী সংশয় জাগে তব উদ্‌বিগ্ন নয়নে।
নিজেরে দেখিতে চাও বাহিরে রাখিয়া আপনারে
যেন আর-কারো চোখে; আর-কারো জীবনের দ্বারে
খুঁজিছ আপন স্থান। প্রেমের অর্ঘ্যের কোনো ত্রুটি
দেখ কি মুখের কোনোখানে। তাই তব আঁখিদুটি
নিজেরে কি করিছে ভর্ৎসনা। সাজায়ে লইয়া সর্বদেহে
স্বর্গের গর্বের ধন, তবে যেতে চাও তার গেহে?
জান না কি, হে রমণী, দর্পণে যা দেখিছ তা ছায়া—
পার' না রচিতে কভু তাই দিয়ে চিরস্থায়ী মায়া।
তিলোত্তমা অনুপমা সুরেন্দ্রের প্রমোদপ্রাঙ্গণে
কঙ্কণঝংকারে আর নৃত্যলোল নূপুরনিক্বণে
নাচিয়া বাহিরে চলে যায়। লয়ে আত্মনিবেদন
গৌরবে জিনিলা শচী ইন্দ্রলোকে নন্দন-আসন॥

১৫ আশ্বিন, ১৩৩৫

ভাবিনী

ভাবিছ যে ভাবনা একা একা
দুয়ারে বসি চুপে চুপে
সে যদি সম্মুখে দিত দেখা
মূর্তি ধরি কোনো রূপে—
হয়তো দেখিতাম, শুকতারা
দিবস পার হয়ে দিশাহারা
এসেছে সন্ধ্যার কিনারাতে
সাঁঝের তারাদের দলে,
উদাস স্মৃতিভরা আঁখিপাতে
উষার হিমকণা জ্বলে ॥

হয়তো দেখিতাম, বাদলে যে
শ্রাবণে এনেছিল বাণী
শরতে জলভার এল ত্যেজে
শুভ্র সেই মেঘখানি।
চলে সে সন্ন্যাসী দিশে দিশে,
রবির আলোকের পিয়াসি সে,
আকাশ আপনারই লিপি লিখে
পড়িতে দিল যেন তারে—
সে তাই চেয়ে চেয়ে অনিমিখে
বুঝিতে বুঝি নাহি পারে ॥

হয়তো দেখিতাম, রজনীতে
সে যেন সুরহারা বীণা
বিজন দীপহীন দেহলিতে
মৌনমাঝে আছে লীনা।
একদা বেজেছিল যে রাগিণী
তারে সে ফিরে যেন নিল চিনি
তারার কিরণের কম্পনে
নীরব আকাশের মাঝে,
সুদূর সুরসভা-অঙ্গনে
সুরের স্মৃতি যেথা বাজে ॥

১৫ আশ্বিন, ১৩৩৫

একাকী

চন্দ্রমা আকাশতলে পরম একাকী—
আপন নিঃশব্দ গানে আপনারই শূন্য দিল ঢাকি।
অয়ি একাকিনী,
অলিন্দে নিশীথরাত্রে শুনিছ সে জ্যোৎস্নার রাগিণী
চেয়ে শূন্যপানে—
যে রাগিণী অসীমের উৎস হতে আনে
অনাদি বিরহরস, তাই দিয়ে ভরিয়া আঁধার
কোন্ বিশ্ববেদনার মহেশ্বরে দেয় উপহার।
তারি সাথে মিলায়েছ তব দৃষ্টিখানি,
চোখে অনির্বচনীয় বাণী—
মিলায়েছ যেন তব জন্মান্তর হতে নিয়ে আসা
দীর্ঘনিশ্বাসের ভাষা।
মিলায়েছ সুগম্ভীর দুঃখের মাঝারে
যে মুক্তি রয়েছে লীন বন্ধহীন শান্ত অন্ধকারে।
অরণ্যে অরণ্যে আজি সাগরে সাগরে,
জনশূন্য তুষারশিখরে
কোন্ মহাশ্বেতা, কোন্ তপস্বিনী বিছালো অঞ্চল,
স্তব্ধ অচঞ্চল—
অনন্তেরে সম্বোধিয়া কহিল সে ঊর্ধ্বে তুলি আঁখি,
‘তুমিও একাকী।’

১৮ আশ্বিন, ১৩৩৫

আশীর্বাদ

জ্বলিল অরুণরশ্মি আজি ওই তরুণ প্রভাতে,
হে নবীনা, নবরাগরক্তিম শোভাতে।
সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু তব
জ্যোতি আজি পেল অভিনব,
চেলাঞ্চলে উদ্ভাসিল অন্তরের দীপ্যমান প্রভা—
শরমের বৃন্তে তুমি আনন্দের বিকশিত জবা॥

শাহানা-রাগিণী-রসে জড়িত আজি এ পুণ্যতিথি,
তোমার ভুবনে আসে পরম অতিথি।
আনো আনো মাঙ্গল্যের ভার,
দাও বধূ, খুলে দাও দ্বার—
তোমার অঙ্গনে হেরো সগৌরবে ওই রথ আসে
সেই বার্তা আজি বুঝি উদ্‌ঘোষিল আকাশে বাতাসে

নবীন জীবনে তব নববিশ্বরচনার ভাষা
আজি বুঝি পূর্ণ হল লয়ে নব আশা।
সৃষ্টির সে আনন্দ-উৎসবে
তব শ্রেষ্ঠধন দিতে হবে,
সেই সৃষ্টিসাধনায় আপনি করিবে আবিষ্কার
তোমার আপনা-মাঝে লুকানো যে ঐশ্বর্যভাণ্ডার॥

পথ কে দেখালো এই পথিকেরে তাহা আমি জানি,
ওই চক্ষুতারা তারে দ্বারে দিল আনি।
যে সুর নিভৃতে ছিল প্রাণে
কেমনে তা শুনেছিল কানে,
তোমার হৃদয়কুঞ্জে যে ফুল ছায়ায় ছিল ফুটে
তাহার অমৃতগন্ধ গিয়েছিল বন্ধ তার টুটে॥

যদি পারিতাম আজি অলকার দ্বারীরে ভুলায়ে
হরিয়া অমূল্য মণি অলকেতে দিতাম দুলায়ে।
তবু মোর মন মোরে কহে,
সে দান তোমার যোগ্য নহে—
তোমার কমলবনে দিব আনি রবির প্রসাদ,
তোমার মিলনক্ষণে সঁপিব কবির আশীর্বাদ॥

? আশ্বিন, ১৩৩৫

নববধূ

চলেছে উজান ঠেলি তরণী তোমার,
দিক্‌প্রান্তে নামে অন্ধকার।
কোন্ গ্রামে যাবে তুমি, কোন্ ঘাটে, হে বধূবেশিনী,
ওগো বিদেশিনী।
উৎসবের বাঁশিখানি কেন-যে কে জানে
ভরেছে দিনান্তবেলা ম্লান মুলতানে,
তোমারে পরালো সাজ মিলি সখীদল
গোপনে মুছিয়া চক্ষুজল॥

মৃদুস্রোত নদীখানি ক্ষীণ কলকলে
স্তিমিত বাতাসে যেন বলে—
'কত বধূ গিয়েছিল কতকাল এই স্রোত বাহি
তীরপানে চাহি।
ভাগ্যের বিধাতা কোনো কহেন নি কথা,
নিস্তব্ধ ছিলেন চেয়ে লজ্জাভয়ে নতা
তরুণী কন্যার পানে, তরী'পরে ছিলেন গোপনে
তরণীর কাণ্ডারীর সনে।'

কোন্ টানে জানা হতে অজানায় চলে
আধো-হাসি আধো-অশ্রুজলে
ঘর ছেড়ে দিয়ে তবে ঘরখানি পেতে হয় তারে
অচেনার ধারে।

ওপারের গ্রাম দেখো আছে ঐ চেয়ে,
বেলা ফুরাবার আগে চলো তরী বেয়ে,
ওই ঘাটে কত বধূ কত শত বর্ষ বর্ষ ধরি
ভিড়ায়েছে ভাগ্যভীরু তরী ॥

জনে জনে রচি গেল কালের কাহিনী,
অনিত্যের নিত্যপ্রবাহিনী।
জীবনের ইতিবৃত্তে নামহীন কর্ম-উপহার
রেখে গেল তার।
আপনার প্রাণসূত্রে যুগ যুগান্তর
গেঁথে গেঁথে চলে গেল না রাখি স্বাক্ষর—
ব্যথা যদি পেয়ে থাকে না রহিল কোনো তার ক্ষত,
লভিল মৃত্যুর সদাব্রত ॥

তাই আজি গোধূলির নিস্তব্ধ আকাশ
পথে তব বিছালো আশ্বাস।
কহিল সে কানে কানে, 'প্রাণ দিয়ে ভরা যার বুক
সেই তার সুখ।
রয়েছে কঠোর দুঃখ, রয়েছে বিচ্ছেদ,
তবু দিন পূর্ণ হবে, রহিবে না খেদ,
যদি ব'লে যাও, বধূ,— আলো দিয়ে জ্বেলেছিনু আলো,
সব দিয়ে বেসেছিনু ভালো!'

১৯ আশ্বিন, ১৩৩৫

পরিণয়

শুভখন আসে সহসা আলোক জ্বেলে,
মিলনের সুধা পরম ভাগ্যে মেলে।
একার ভিতরে একের দেখা না পাই,
দুজনার যোগে পরম একের ঠাঁই—
সে একের মাঝে আপনারে খুঁজে পেলে॥

আপনারে দান সেই তো চরম দান,
আকাশে আকাশে তারি লাগি আহ্বান।
ফুলবনে তাই রূপের তুফান লাগে,
নিশীথে তারায় আলোর ধেয়ান জাগে,
উদয়সূর্য গাহে জাগরণীগান॥

নীরবে গোপনে মর্তভুবন'পরে
অমরাবতীর সুরসুরধুনী ঝরে।
যখনি হৃদয়ে পশিল তাহার ধারা
নিজেরে জানিলে সীমার-বাঁধন-হারা,
স্বর্গের দীপ জ্বলিল মাটির ঘরে॥

আজি বসন্ত চিরবসন্ত হোক,
চিরসুন্দরে মজুক তোমার চোখ।
প্রেমের শান্তি চিরশান্তির বাণী
জীবনের ব্রতে দিনে রাতে দিক্ আনি,
সংসারে তব নামুক অমৃতলোক॥

১২ ফাল্গুন, ১৩৩৪

মিলন

সৃষ্টির প্রাঙ্গণে দেখি বসন্তে অরণ্যে ফুলে ফুলে
দুটিরে মিলানো নিয়ে খেলা।
রেণুলিপি বহি বায়ু প্রশ্ন করে মুকুলে মুকুলে,
কবে হবে ফুটিবার বেলা।
তাই নিয়ে বর্ণচ্ছটা, চঞ্চলতা শাখায় শাখায় ;
সুন্দরের ছন্দ বহে প্রজাপতি পাখায় পাখায় ;
পাখির সংগীত-সাথে বন হতে বনান্তরে ধায়
উচ্ছ্বসিত উৎসবের মেলা॥

সৃষ্টির সে রঙ্গ আজি দেখি মানবের লোকালয়ে
দুজনায় গ্রন্থির বাঁধন।
অপূর্ব জীবন তাহে জাগিবে বিচিত্র রূপ লয়ে
বিধাতার আপন সাধন
ছেড়েছে সকল কাজ, রঙিন বসনে ওরা সেজে
চলেছে প্রান্তর বেয়ে, পথে পথে বাঁশি চলে বেজে ;
পুরানো সংসার হতে জীর্ণতার সব চিহ্ন মেজে
রচিল নবীন আচ্ছাদন॥

যাহা সব-চেয়ে সত্য সব-চেয়ে খেলা যেন তাই,
যেন সে ফাল্গুনকল্লোল্লাস।
যেন তাহা নিঃসংশয়, মর্তের ম্লানতা যেন নাই,
দেবতার যেন সে উচ্ছ্বাস।

সহজে মিশেছে তাই আত্মভোলা মানুষের সনে
আকাশের আলো আজি গোধূলির রক্তিম লগনে,
বিশ্বের রহস্যলীলা মানুষের উৎসবপ্রাঙ্গণে
লভিয়াছে আপন প্রকাশ ॥

বাজা তোরা বাজা বাঁশি, মৃদঙ্গ উঠুক তালে মেতে
দুরন্ত-নাচের-নেশা-পাওয়া।
নদীপ্রান্তে তরুগুলি ঐ দেখ্ আছে কান পেতে,
ঐ সূর্য চাহে শেষ চাওয়া।
নিবি তোরা তীর্থবারি সে অনাদি উৎসের প্রবাহে
অনন্তকালের বক্ষ নিমগ্ন করিতে যাহা চাহে
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে, তরঙ্গিতসংগীত-উৎসাহে
জাগায় প্রাণের মত্ত হাওয়া ॥

সহস্র দিনের মাঝে আজিকার এই দিনখানি
হয়েছে স্বতন্ত্র চিরন্তন।
তুচ্ছতার বেড়া হতে মুক্তি তারে কে দিয়েছে আনি,
প্রত্যহের ছিঁড়েছে বন্ধন।
প্রাণদেবতার হাতে জয়টিকা পরেছে সে ভালে,
সূর্যতারকার সাথে স্থান সে পেয়েছে সমকালে,
সৃষ্টির প্রথম বাণী যে প্রত্যাশা আকাশে জাগালে
তাই এল করিয়া বহন ॥

২০ আশ্বিন, ১৩৩৫

বন্দিনী

তুমি বনের পুব পবনের সাথি,
বাদল-মেঘের পথে তোমার ডানার মাতামাতি।
ওগো পাখি, বাঁধন-হারা পাখি,
খাঁচার কোণে এই বিজনে আপন মনে থাকি।
হায় অজানা, জানি না সে—
উধাও তুমি কোন্ আকাশে,
কোন্ তমালের কুঞ্জতলে মধ্যদিনের তাপে
বনচ্ছায়ার শিরায় শিরায় তোমারই সুর কাঁপে॥

কোন্ রঙনে রঙিন তোমার পাখা।
তোমার সোনার বরনখানি চিত্তায় মোর আঁকা।
ওগো পাখি, বাঁধন-হারা পাখি,
মুক্তরূপের ধ্যানের ছায়ায় মগ্ন আমার আঁখি।
বন্দী মনের বদ্ধ ডানা,
চতুর্দিকে কঠোর মানা,
তোমার সাথে উড়ে চলার মিলন মাগি মনে—
শূন্যে সদাই গান ফেরে তাই অসীম অন্বেষণে॥

গান গাওয়া মোর সেই মিলনের খেলা,
তোমার গানের ছন্দে আমার স্বপন-পাখা মেলা।
ওগো পাখি, বাঁধন-হারা পাখি,
মনে মনে তোমায় পরাই গানের গাঁথন রাখী।

আজি আমার সুরের মাঝে
দূরের ডানার শব্দ বাজে,
মেঘের পথিক গানে আমার এল প্রাণের কূলে—
বিরহেরই আকাশ-তলে নিল আমায় তুলে॥

গানের হাওয়ায় নিকট মিলায় দূরে,
দূর আসে সেই হাওয়ায় প্রাণের নিকট অন্তঃপুরে।
ওগো পাখি, বাঁধন-হারা পাখি,
তোমার গানের মরীচিকায় শূন্য যে দাও ঢাকি।
বাঁধনে তাই জাদু লাগে,
বীণার তারে মূর্তি জাগে,
রাগিণীতে মুক্তি সে পায়— ওগো আমার দূর,
তোমার দেওয়া না-শোনা গান বাঁধে যে তার সুর

৫ কার্তিক, ১৩৩৫

গুপ্তধন

আরো কিছুখন নাহয় বসিয়ো পাশে,
আরো যদি কিছু কথা থাকে তাই বলো।
শরৎ-আকাশ হেরো ম্লান হয়ে আসে,
বাষ্প-আভাসে দিগন্ত ছলোছলো।
জানি তুমি কিছু চেয়েছিলে দেখিবারে,
তাই তো প্রভাতে এসেছিলে মোর দ্বারে,
দিন না ফুরাতে দেখিতে পেলে কি তারে
হে পথিক, বলো বলো—
সে মোর অগম অন্তরপারাবারে
রক্তকমল তরঙ্গে টলোমলো॥

দ্বিধাভরে আজও প্রবেশ কর' নি ঘরে,
বাহির-আঙনে করিলে স্বরের খেলা—
জানি না কী নিয়ে যাবে যে দেশান্তরে,
হে অতিথি, আজি শেষ-বিদায়ের বেলা।
প্রথম প্রভাতে সব কাজ তব ফেলে
যে গভীর বাণী শুনিবারে কাছে এলে,
কোনোখানে কিছু ইশারা কি তার পেলে
হে পথিক, বলো বলো—
সে বাণী আপন গোপন প্রদীপ জ্বেলে
রক্ত-আগুনে প্রাণে মোর জ্বলোজ্বলো॥

১৪ কার্তিক, ১৩৩৫

প্রত্যাগত

দূরে গিয়েছিলে চলি ; বসন্তের আনন্দভাণ্ডার
তখনো হয় নি নিঃস্ব ; আমার বরণপুষ্পহার
তখনো অম্লান ছিল ললাটে তোমার। হে অধীর,
কোন্ অলিখিত লিপি দক্ষিণের উদ্‌ভ্রান্ত সমীর
এনেছিল চিত্তে তব। তুমি গেলে বাঁশি লয়ে হাতে,
ফিরে দেখ নাই চেয়ে আমি বসে আপন বীণাতে
বাঁধিতেছিলাম সুর গুঞ্জরিয়া বসন্তপঞ্চমে ;
আমার অঙ্গনতলে আলো আর ছায়ার সংগমে
কম্পমান আম্রতরু করেছিল চাঞ্চল্য বিস্তার
সৌরভবিহ্বল শুক্লরাতে। সেই কুঞ্জগৃহদ্বার
এতকাল মুক্ত ছিল। প্রতি দিন মোর দেহলিতে
আঁকিয়াছি আলিপনা। প্রতি সন্ধ্যা বরণডালিতে
গন্ধতৈলে জ্বালায়েছি দীপ। আজি কতকাল পরে
যাত্রা তব হল অবসান। হেথা ফিরিবার তরে
হেথা হতে গিয়েছিলে। হে পথিক, ছিল এ লিখন—
আমারে আড়াল ক'রে আমারে করিবে অন্বেষণ ;
সুদূরের পথ দিয়ে নিকটেরে লাভ করিবারে
আহ্বান লভিয়াছিলে সখা। আমার প্রাঙ্গণদ্বারে
যে পথ করিলে শুরু সে পথের এখানেই শেষ॥

হে বন্ধু, কোরো না লজ্জা, মোর মনে নাই ক্ষোভলেশ,
নাই অভিমানতাপ। করিব না ভর্ৎসনা তোমায় ;
গভীর বিচ্ছেদ আজি ভরিয়াছি অসীম ক্ষমায়।
আমি আজি নবতর বধূ ; আজি শুভদৃষ্টি তব
বিরহগুণ্ঠনতলে দেখে যেন মোরে অভিনব
অপূর্ব আনন্দরূপে, আজি যেন সকল সন্ধান
প্রভাতে নক্ষত্রসম শুভ্রতায় লভে অবসান।
আজি বাজিবে না বাঁশি, জ্বলিবে না প্রদীপের মালা,
পরিব না রক্তাম্বর ; আজিকার উৎসব নিরালা
সর্ব-আভরণহীন। আকাশেতে প্রতিপদ-চাঁদ
কৃষ্ণপক্ষ পার হয়ে পূর্ণতার প্রথম প্রসাদ
লভিয়াছে। দিক্‌প্রান্তে তারি ওই ক্ষীণ নম্র কলা
নীরবে বলুক আজি আমাদের সব কথা বলা॥

২৭ পৌষ, ১৩৩৫

পুরাতন

যে গান গাহিয়াছিনু কবেকার দক্ষিণবাতাসে
সে গান আমার কাছে কেন আজ ফিরে ফিরে আসে
শরতের অবসানে। সেদিনের শাহানার সুর
আজি অসময়ে এসে অকারণে করিছে বিধুর
মধ্যাহ্নের আকাশেরে; দিগন্তের অরণ্যরেখায়
দূর অতীতের বাণী লিপ্ত আছে অস্পষ্ট লেখায়,
তাহারে ফুটাতে চাহে। পথভ্রান্ত করুণ গুঞ্জনে
মধু আহরিতে ফিরে, সেদিনের অকৃপণ বনে
যে চামেলিবল্লী ছিল তারি শূন্য দানসত্র হতে।
ছায়াতে যা লীন হল তারে খোঁজে নিষ্ঠুর আলোতে।
শীতরিক্ত শাখা ছেড়ে পাখি গেছে সিন্ধুপারে চলি,
তারি কুলায়ের কাছে সে-কালের বিস্মৃত কাকলী
বৃথাই জাগাতে আসে। যে তারকা অস্তে গেল দূরে
তাহারি স্পন্দন ও-যে ধরিয়া এনেছে নিজ সুরে॥

পৌষ, ১৩৩৫

ছায়া

আঁখি চাহে তব মুখপানে,
তোমারে জেনেও নাহি জানে।
কিসের নিবিড় ছায়া
নিয়েছে স্বপনকায়া
তোমার মর্মের মাঝখানে॥

হাসি কাঁপে অধরের শেষে
দূরতর অশ্রুর আবেশে।
বসন্তকূজিত রাতে
তোমার বাণীর সাথে
অশ্রুত কাহার বাণী মেশে॥

মনে তব গুপ্ত কোন্ নীড়ে
অব্যক্ত ভাবনা এসে ভিড়ে।
বসন্তপঞ্চমরাগে
বিচ্ছেদের ব্যথা লাগে
সুগভীর ভৈরবীর মিড়ে॥

তোমার শ্রাবণপূর্ণিমাতে
বাদল রয়েছে সাথে সাথে।
হে করুণ ইন্দ্রধনু,
তোমার মানসী তনু
জন্ম নিল আলোতে ছায়াতে ॥

অদৃশ্যের বরণের ডালা,
প্রচ্ছন্ন প্রদীপ তাহে জ্বালা।
মিলননিকুঞ্জতলে
দিয়েছ আমার গলে
বিরহের সূত্রে গাঁথা মালা ॥

তব দানে, ওগো আনমনা,
দিয়ো মোরে তোমার বেদনা।
যে বন কুয়াশা-ছাওয়া
ঝরা ফুল সেথা পাওয়া,
থাক্ তাহে শিশিরের কণা ॥

৫ ভাদ্র, ১৩৩৬

বাসরঘর

তোমারে ছাড়িয়ে যেতে হবে
রাত্রি যবে
উঠিবে উন্মনা হয়ে প্রভাতের রথচক্ররবে।
হায় রে বাসরঘর,
বিরাট বাহির সে-যে বিচ্ছেদের দস্যু ভয়ংকর।
তবু সে যতই ভাঙেচোরে,
মালাবদলের হার যত দেয় ছিন্ন ছিন্ন ক'রে,
তুমি আছ ক্ষয়হীন
অনুদিন ;
তোমার উৎসব
বিচ্ছিন্ন না হয় কভু, না হয় নীরব।
কে বলে, তোমারে ছেড়ে গিয়েছে যুগল
শূন্য করি তব শয্যাতল।
যায় নাই, যায় নাই,
নব নব যাত্রীমাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তারাই
তোমার আহ্বানে
উদার তোমার দ্বারপানে।
হে বাসরঘর,
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর ॥

আষাঢ়, ১৩৩৫
[বাঙ্গালোর]

বিচ্ছেদ

রাত্রি যবে সাঙ্গ হল, দূরে চলিবারে
দাঁড়াইলে দ্বারে।
আমার কণ্ঠের যত গান
করিলাম দান
তুমি হাসি
মোর হাতে দিলে তব বিরহের বাঁশি।
তার পরদিন হতে
বসন্তে শরতে
আকাশে বাতাসে উঠে খেদ,
কেঁদে কেঁদে ফিরে বিশ্বে বাঁশি আর গানের বিচ্ছেদ॥

৯ আষাঢ়, ১৩৩৫
[বাঙ্গালোর]

বিদায়

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও।
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্দন,
চক্রে-পিষ্ট আঁধারের বক্ষ-ফাটা তারার ক্রন্দন ॥

ওগো বন্ধু,
সেই ধাবমান কাল
জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেলি তার জাল—
তুলে নিল দ্রুতরথে
দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে
তোমা হতে বহুদূরে।
মনে হয়, অজস্র মৃত্যুরে
পার হয়ে আসিলাম
আজি নবপ্রভাতের শিখরচূড়ায়—
রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়
আমার পুরানো নাম।
ফিরিবার পথ নাহি ;
দূর হতে যদি দেখ চাহি
পারিবে না চিনিতে আমায়।
হে বন্ধু, বিদায় ॥

কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে,
বসন্তবাতাসে
অতীতের তীর হতে যে রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,
সেই ক্ষণে খুঁজে দেখো— কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে ; বিস্মৃতপ্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মুরতি।
তবু সে তো স্বপ্ন নয়—
সব চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,
সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে।
পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায়।
হে বন্ধু, বিদায়॥

তোমার হয় নি কোনো ক্ষতি—
মর্তের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃতমুরতি
যদি সৃষ্টি করে থাক, তাহারি আরতি
হোক তব সন্ধ্যাবেলা,
পূজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ লেগে ;
তৃষার্ত আবেগবেগে
ভ্রষ্ট নাহি হবে তার কোনো ফুল নৈবেদ্যের থালে।

তোমার মানস-ভোজে সযত্নে সাজালে
যে ভাবরসের পাত্র বাণীর তৃষায়
তার সাথে দিব না মিশায়ে
যা মোর ধূলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে
আজও তুমি নিজে
হয়তো-বা করিবে রচন
মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট তোমার বচন—
ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায়।
হে বন্ধু, বিদায়॥

মোর লাগি করিয়ো না শোক,
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই—
শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।
উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
সেই ধন্য করিবে আমাকে।
শুক্লপক্ষ হতে আনি
রজনীগন্ধার বৃন্তখানি
যে পারে সাজাতে
অর্ঘ্যথালা কৃষ্ণপক্ষ-রাতে,
যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।

তোমারে যা দিয়েছিনু তার
পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার।
হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডূষ ভরিয়া করে পান
হৃদয়-অঞ্জলি হতে মম।
ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্যবান্,
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান—
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়
হে বন্ধু, বিদায়॥

২৫ জুন, ১৯২৮
ব্যাঙ্গালোর, বাঙ্গালোর

প্রণতি

কত ধৈর্য ধরি
ছিলে কাছে দিবসশর্বরী।
তব পদ-অঙ্কনগুলিরে
কতবার দিয়ে গেছ মোর ভাগ্য-পথের ধূলিরে
আজ যবে
দূরে যেতে হবে
তোমারে করিয়া যাব দান
তব জয়গান॥

কতবার ব্যর্থ আয়োজনে
এ জীবনে
হোমাগ্নি উঠে নি জ্বলি,
শূন্যে গেছে চলি
হতাশ্বাস ধূমের কুণ্ডলী।
কতবার ক্ষণিকের শিখা
আঁকিয়াছে ক্ষীণ টিকা
নিশ্চেতন নিশীথের ভালে।
লুপ্ত হয়ে গেছে তাহা চিহ্নহীন কালে॥

এবার তোমার আগমন
হোমহুতাশন
জ্বেলেছে গৌরবে।
যজ্ঞ মোর ধন্য হবে।
আমার আহুতি দিনশেষে
করিলাম সমর্পণ তোমার উদ্দেশে ॥

লহো এ প্রণাম
জীবনের পূর্ণ পরিণাম।
এ প্রণতি'পরে
স্পর্শ রাখো স্নেহভরে।
তোমার ঐশ্বর্যমাঝে
সিংহাসন যেথায় বিরাজে
করিয়ো আহ্বান,
সেথা এ প্রণতি মোর পায় যেন স্থান ॥

[আষাঢ়, ১৩৩৫
বাঙ্গালোর]

নৈবেদ্য

তোমারে দিই নি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি
রজনীর শুভ্র অবসানে— কিছু আর নাহি বাকি,
নাইকো প্রার্থনা, নাই প্রতি মুহূর্তের দৈন্যরাশি,
নাই অভিমান, নাই দীন কান্না, নাই গর্বহাসি,
নাই পিছে ফিরে দেখা। শুধু সে মুক্তির ডালিখানি
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি॥

[আষাঢ়, ১৩৩৫
বাঙ্গালোর]

অশ্রু

সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া
এনেছ অশ্রুজল।
এনেছ তোমার বক্ষে ধরিয়া
দুঃসহ হোমানল।
দুঃখ যে তাই উজ্জ্বল হয়ে উঠে,
মুগ্ধ প্রাণের আবেশবন্ধ টুটে,
এ তাপে শ্বসিয়া উঠে বিকশিয়া
বিচ্ছেদশতদল॥

[আষাঢ়, ১৩৩৫
বাঙ্গালোর]

অন্তর্ধান

তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন।
অন্তরে অলক্ষ্যলোকে তোমার পরম আগমন।
লভিলাম চিরস্পর্শমণি ;
তোমার শূন্যতা তুমি পরিপূর্ণ করেছ আপনি।

জীবন আঁধার হল, সেই ক্ষণে পাইনু সন্ধান
সন্ধ্যার দেউলদীপ অন্তরে রাখিয়া গেছ দান।
বিচ্ছেদেরই হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরে প্রেম, দেখা দেয় দুঃখের আলোতে

২৬ আষাঢ়, ১৩৩৫
[শান্তিনিকেতন]

বিরহ

শঙ্কিত আলোক নিয়ে দিগন্তে উদিল শীর্ণ শশী,
অরণ্যে শিরীষশাখে অকস্মাৎ উঠিল উচ্ছ্বসি
বসন্তের হাওয়ার খেয়াল—
ব্যথায় নিবিড় হল শেষবাক্য বলিবার কাল ॥

গোধূলির গীতিশূন্য স্তম্ভিত প্রহরখানি বেয়ে
শান্ত হল শেষ দেখা— নির্নিমেষ রহিলাম চেয়ে।
ধীরে ধীরে বনান্তে মিলালো
প্রান্তরের প্রান্ততটে অস্তশেষ ক্ষীণপাংশু আলো ॥

যে দ্বার খুলিয়া গেলে রুদ্ধ সে হবে না কোনোমতে।
কান পাতি রবে তব ফিরিবার প্রত্যাশার পথে—
তোমার অমূর্ত আসা-যাওয়া
যে পথে চঞ্চল করে দিগ্‌বালার অঞ্চলের হাওয়া ॥

বসন্তে মাঘের অন্তে আম্রবনে মুকুলমত্ততা
মধুপগুঞ্জনে মিশি আনে কোন্ কানে-কানে-কথা।
মোর নাম তব-কণ্ঠে-ডাকা
শান্ত আজি তাপক্লান্ত দিনান্তের মৌন দিয়ে ঢাকা ॥

সঙ্গহীন স্তব্ধতার সুগম্ভীর নিবিড় নিভৃতে
বাক্যহারা চিত্তে মোর এতদিনে পাইনু শুনিতে
তুমি কবে মর্মমাঝে পশি
আপন মহিমা হতে রেখে গেলে বাণী মহীয়সী ॥

২৬ আষাঢ়, ১৩৩৫
[শান্তিনিকেতন]

বিদায়সম্বল

যাবার দিকের পথিকের 'পরে
ক্ষণিকার স্নেহখানি
শেষ উপহার করুণ অধরে
দিল কানে কানে আনি।
'ভুলিব না কভু— রবে মনে মনে'
এই মিছে আশা দেয় খনে খনে,
ছলছল ছায়া নবীন নয়নে,
বাধোবাধো মৃদু বাণী॥

যাবার দিকের পথিক সে কথা
ভরি লয় তার প্রাণে।
পিছনের এই শেষ আকুলতা
পাথেয় বলি সে জানে।
যখন আঁধারে ভরিবে সরণী,
ভুলে-ভরা ঘুমে নীরব ধরণী,
'ভুলিব না কভু' এই ক্ষীণ ধ্বনি
তখনো বাজিবে কানে॥

যাবার দিকের পথিক সে বোঝে—
যে যায় সে যায় চ'লে :
যারা থাকে তারা এ উহারে খোঁজে,
যে যায় তাহারে ভোলে।
তবুও নিজেরে ছলিতে ছলিতে
বাঁশি বাজে মনে চলিতে চলিতে,
'ভুলিব না কভু' বিভাসে ললিতে
এই কথা বুকে দোলে॥

৩ ভাদ্র, ১৩৩৪
সিঙাপুর

দিনান্তে

বাহিরে তুমি নিলে না মোরে, দিবস গেল বয়ে,
তাহাতে মোর যা হয় হোক ক্ষতি—
অন্তরে যা দিবার ছিল মিলিছে এক হয়ে,
চরণে তব গোপনে তার গতি।
লুকায়ে ছিল ছায়াতে ফুল, ভরিল তব ডালি ;
গন্ধ-ভরা বন্দনাতে দিয়েছি ধূপ জ্বালি ;
প্রদীপ ছিল মলিনশিখা, ধোঁওয়াতে ছিল কালী,
দীপ্ত হয়ে উঠিছে তার জ্যোতি।
বাহির হতে না যদি লও পূজার এই ডালি
চরণে তব গোপনে তার গতি॥

নাহয় তুমি ও পারে থাক, এ পারে আমি থাকি
নীরব এই নীরস মরুতীরে—
অন্ধকারে সন্ধ্যাতারা নয়নে দেয় আঁকি
সুদূর তব উদার আঁখিটিরে।
ব্যথায় মম তোমারি ছায়া পড়িছে মোর প্রাণে,
বিরহ হানি তোমারি বাণী মিলিছে মোর গানে,
অলখ স্রোতে ভাবনা ধায় তোমার তটপানে
এ পার হতে বহিয়া মোর নতি।
যে বীণা তব মন্দিরেতে বাজে নি তানে তানে
চরণে তব নীরবে তার গতি॥

১ শ্রাবণ, ১৩৩৪
আম্বোয়াজ জাহাজ

অবশেষ

বাহির-পথে বিবাগি হিয়া
কিসের খোঁজে গেলি,
আয় রে ফিরে আয়।
পুরানো ঘরে দুয়ার দিয়া
ছেঁড়া আসন মেলি
বসিবি নিরালায়।
সারাটা বেলা সাগরধারে
কুড়ালি যত নুড়ি,
নানা রঙের শামুকভারে
বোঝাই হল ঝুড়ি,
লবণপারাবারের পারে
প্রখর তাপে পুড়ি
মরিলি পিপাসায়—
ঢেউয়ের দোল তুলিল রোল
অকূলতল জুড়ি,
কহিল বাণী কী জানি কী ভাষায়।
আয় রে ফিরে আয়॥

বিরাম হল আরামহীন
যদি রে তোর ঘরে,
না যদি রয় সাথি,
সন্ধ্যা যদি তন্দ্রালীন
মৌন অনাদরে,
না যদি জ্বালে বাতি—
তবু তো আছে আঁধার কোণে
ধ্যানের ধনগুলি,
একেলা বসি আপনমনে
মুছিবি তার ধূলি,
গাঁথিবি তারে রতনহারে,
বুকেতে নিবি তুলি
মধুর বেদনায়।
কাননবীথি ফুলের রীতি
নাহয় গেছে ভুলি,
তারকা আছে গগনকিনারায়।
আয় রে ফিরে আয়

২৯ চৈত্র, ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

শেষ মধু

বসন্তবায় সন্ন্যাসী হায়
চৈৎ-ফসলের শূন্য খেতে
মৌমাছিদের ডাক দিয়ে যায়
বিদায় নিয়ে যেতে যেতে—

আয় রে ওরে মৌমাছি, আয়,
চৈত্র যে যায় পত্রঝরা,
গাছের তলায় আঁচল বিছায়
ক্লান্তি-অলস বসুন্ধরা।
সজনে ঝুলায় ফুলের বেণী,
আমের মুকুল সব ঝরে নি,
কুঞ্জবনের প্রান্তপারে
আকন্দ রয় আসন পেতে।
আয় রে তোরা মৌমাছি, আয়,
আসবে কখন শুকনো খরা—
প্রেতের নাচন নাচবে তখন
রিক্ত নিশায় শীর্ণ জরা॥

শুনি যেন কাননশাখায়
বেলাশেষের বাজায় বেণু—
মাখিয়ে নে আজ পাখায় পাখায়
স্মরণ-ভরা গন্ধরেণু।

কাল যে কুসুম পড়বে ঝরে
তাদের কাছে নিস গো ভরে
ওই বছরের শেষের মধু
এই বছরের মৌচাকেতে।
নূতন দিনের মৌমাছি, আয়,
নাই রে দেরি, করিস ত্বরা—
শেষের দানে ঐ রে সাজায়
বিদায়দিনের দানের ভরা॥

চৈত্রমাসের হাওয়ায় কাঁপা
দোলন-চাঁপার কুঁড়িখানি
প্রলয়দাহের রৌদ্রতাপে
বৈশাখে আজ ফুটবে জানি।
যা-কিছু তার আছে দেবার
শেষ করে সব নিবি এবার,
যাবার বেলায় যাক চলে যাক
বিলিয়ে দেবার নেশায় মেতে।
আয় রে ওরে মৌমাছি, আয়,
আয় রে গোপন-মধু-হরা,
চরম দেওয়া সঁপিতে চায়
ঐ মরণের স্বয়ম্বরা॥

১২ চৈত্র, ১৩৩৩
[শান্তিনিকেতন]

প্রথম ছত্রের সূচী

অজানা খনির নূতন মণির গেঁথেছি হার ... ৪৭
অজানা জীবন বাহিনু ... ৪৩
আঁখি চাহে তব মুখপানে ... ১৪১
আচ্ছাদন হতে ... ৩৭
আজি এ নিরালা কুঞ্জে ... ৩৯
আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা ... ৫৩
আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায় ... ১৯
আমি যেন গোধূলিগগন ... ২৭
আরো কিছুখন নাহয় বসিয়ো পাশে ... ১৩৭
একদা বিজনে যুগল তরুর মূলে ... ৮৭
ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী ... ১৭
*কত ধৈর্য ধরি . ১৪৯
কলছন্দে পূর্ণ তার প্রাণ ... ৯৯
*কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও ... ১৪৫
কাহারে পরাব রাখী যৌবনের রাখীপূর্ণিমায় ... ৮১
কোথা আছ! ডাকি আমি। শোনো, শোনো, আছে প্রয়োজন ৮৩
চতুর্দশী এল নেমে ... ১১৩
চন্দ্রমা আকাশতলে পরম একাকী ... ১২৭
চলেছে উজান ঠেলি তরণী তোমার ... ১৩০
চাহনি তাহার, সব কোলাহল হলে সারা .. ১০০
চিত্তকোণে ছন্দে তব ... ৩২
চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাঙাল ... ৬১
ছিনু আমি বিষাদে মগনা ... ৫৭
জনতার মাঝে .. ১০১
জলিল অরুণরশ্মি আজি ওই তরুণ প্রভাতে ... ১২৮
*ঝর্না, তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছ ধারা ... ৩৪
তখন বর্ষণহীন অপরাহ্নমেঘে ... ৫৯
*তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন ... ১৫৩

তরুলতা যে ভাষায় কয় কথা ... ১১১
তুমি বনের পুব পবনের সাথি ... ১৩৫
তোমার প্রত্যাশা লয়ে আছি প্রিয়তমে ... ৬৫
তোমারে আপন কোণে স্তব্ধ করি যবে ... ৭৯
*তোমারে ছাড়িয়ে যেতে হবে ... ১৪৩
*তোমারে দিই নি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি ... ১৫১
তোমারে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথ্যা কখনো কহি নি ... ৮৯
দর্পণ লইয়া তারে কী প্রশ্ন শুধাও একমনে ... ১২৪
দূর মন্দিরে সিন্ধুকিনারে ... ৭৭
দূরে গিয়েছিলে চলি, বসন্তের আনন্দভাণ্ডার ... ১৩৮
নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার ... ৬৩
*পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি ... ৫৫
পবন দিগন্তের দুয়ার নাড়ে ... ১৯
পুরাণে বলেছে ... ৭৪
প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভারে চিত্ত তার নত ... ৯৪
প্রথম মিলনদিন, সে কি হবে নিবিড় আষাঢ়ে ... ৬৭
প্রথম সৃষ্টির ছন্দখানি ... ১১৫
প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায় ফাগুন মাসে ... ২৩
ফিরাবে তুমি মুখ ... ৫১
বসন্তবায় সন্ন্যাসী হায় ... ১৬১
বসন্তের জয়রবে ... ২১
ব্যঙ্গসুনিপুণা ... ১০২
বাহির-পথে বিবাগি হিয়া ... ১৫৯
বাহিরে তুমি নিলে না মোরে, দিবস গেল বয়ে ... ১৫৮
বাহিরে সে দুরন্ত আবেগে ... ১০৪
বিদেশে ঐ সৌধশিখর'পরে ... ১২১
বিবশ দিন, বিরস কাজ ... ২২
বিরক্ত আমার মন কিংশুকের এত গর্ব দেখি ... ৮৭
বোলো তারে, বোলো ... ৪৫
ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু ... ১১

ভাবিছ যে ভাবনা একা একা ... ১২৫
ভোরের আগের যে প্রহরে ... ১১৬
ভোরের পাখি নবীন আঁখিদুটি ... ৪১
মধ্যাহ্নে বিজন বাতায়নে ... ৯৭
মণিমালা হাতে নিয়ে ... ৩০
মাঘের সূর্য উত্তরায়ণে ... ১৩
যাবার দিকের পথিকের 'পরে ... ১৫৬
যারে সে বেসেছে ভালো তারে সে কাঁদায় ... ৯৫
যে গান গাহিয়াছিনু কবেকার দক্ষিণবাতাসে ... ১৪০
যে শক্তির নিত্যলীলা নানা বর্ণে আঁকা ... ১০৮
যে সন্ধ্যায় প্রসন্ন লগনে ... ৩১
যেথায় তুমি গুণী জ্ঞানী, যেথায় তুমি মানী ... ১১৮
যেন তার চক্ষুমাঝে ... ১০৫
রাত্রি যবে সাঙ্গ হল, দূরে চলিবারে ... ১৪৪
*রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী করে ... ৪৯
শঙ্কিত আলোক নিয়ে দিগন্তে উদিল শীর্ণ শশী ... ১৫৪
শ্লথপ্রাণ দুর্বলের স্পর্ধা আমি কভু সহিব না ... ৮১
শুধায়ো না, কবে কোন্ গান ... উৎসর্গ
শুভখন আসে সহসা আলোক জ্বেলে ... ১৩২
সাগরজলে সিনান করি সজল এলোচুলে ... ৭০
*সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া ... ১৫২
*সুন্দরী তুমি শুকতারা ... ৩৫
সূর্যমুখীর বর্ণে বসন ... ২৫
সৃষ্টির প্রাঙ্গণে দেখি বসন্তে অরণ্যে ফুলে ফুলে ... ১৩৩
সৃষ্টির রহস্য আমি তোমাতে করেছি অনুভব ... ৯১
সে যেন খসিয়া-পড়া তারা ... ১০৬
সে যেন গ্রামের নদী ... ৯২
হাসিমুখ নিয়ে যায় ঘরে ঘরে ... ১১০

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭
মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস্ লিমিটেড্। ৪৭, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ। কলিকাতা-১৩
৫·১